আবার ডাকবাংলার ডাকে

আবার
ডাকবাংলার ডাকে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৭২ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

সূচীপত্র

যাচ্ছি বনগাঁয়

ঠিক ছিল ভোরবেলার ট্রেন ধরব। রাত্তিরে প্রায় না ঘুমিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে শেয়ালদায় টিকিট কেটে যখন প্ল্যাটফর্মে পৌছুলাম দেখি সব ছত্রভঙ্গ অবস্থা। আগের দিন এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ট্রেন আদৌ যাবে কি যাবে না অনুসন্ধান আপিসও তা নিশ্চয় করে বলতে পারছে না।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত টিকিট ফেরত দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। বনগাঁয় যাব বলা ছিল। অবশ্য আমার না-পৌঁছানোর কারণটা নিশ্চয় তাঁরা আঁচ করতে পারবেন। যা ছিরি এখন যানবাহনের।

আমার অনেকদিনের ইচ্ছে নতুন করে আরেকবার ডাকবাংলার ডায়রি লিখব। প্রথমটা লিখতে শুরু করেছিলাম প্রায় দু দশক আগে। সে আজ কম দিন হল না।

গ্রাম বাংলায় আমি ঘুরতে শুরু করি দুর্ভিক্ষের ঠিক পরে পরে। তখনও যুদ্ধ চলছে। আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা 'জনযুদ্ধে'র পৃষ্ঠায় ধরা আছে। পরে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেই মালমশলা দিয়েই লিখে-ছিলাম 'আমার বাংলা'। তার আগে অবধি পদ্য লিখে লিখে আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে গদ্য লিখতে গিয়ে কলম ভেঙে ফেলি। আমাকে কিলচড় মেরে গদ্য লিখতে শিখিয়েছিলেন

সোমনাথ লাহিড়ী। তিনিই ফুটিয়ে দিয়েছিলেন আমার দেখবার চোখ, শোনবার কান।

তারপর দেশ ভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হল। দেখা জায়গাগুলো অনেকদিন পরে নতুন করে দেখব মনে মনে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেশ আর কালের পাঁচিল পেরোতে পারি নি।

'আনন্দবাজারে' যখন ডাকবাংলার ডায়রি শুরু করি, তখন আমার ইচ্ছে ছিল একটাই। প্রত্যেকটা জেলারই একটা-দুটো অঞ্চলে যাব। দেখার চেষ্টা করব স্বাধীনতার পর কোথায় কতটা কী বদলেছে। পুরোপুরি না হলেও, সে ইচ্ছে খানিকটা পূরণ করেছিলাম।

আমি গবেষক নই। সব কিছু জরিপ করে দেখতে হলে যে-তালিম দরকার তাও আমার নেই। ফলে, আমার জায়গা বাছাইয়ের পেছনে যুক্তির কোনো সূত্র নেই। যখন যেখানে যাবার সুযোগ পেয়েছি গিয়েছি বা চোখে পড়েছে দেখেছি। যা কানে এসেছে শুনেছি। আমার সবটাই হল সেই দেখাশোনার গল্প। শোনা বলতে, অন্য কারো দেখা।

গল্পের বদলে অন্য যে কথাটা ব্যবহার করতে পারতাম, তা হল সত্য। কিন্তু অত বড় দাবি করা সম্ভব নয়। বড় জোর বলতে পারি আমার জ্ঞানমতে সত্য। আমরা চোখে যা দেখি তার সবটাই তো ষোলআনা ঠিক নয়। শোনার কথা বাদই দিচ্ছি। 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' শুরু করার আগে এই কথাগুলো জানিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে পরে ভুল বোঝাবুঝি, একেবারে না হলেও, হয়ত খানিকটা এড়ানো যেতে পারে।

'ডাকবাংলার ডায়রি' লেখার সময় যে যে জায়গায় গিয়েছিলাম, আমি চেষ্টা করব আবার সেই সেই জায়গায় যেতে। এই দু দশকে সেই সব জায়গার কতটা কী বদল হয়েছে দেখেশুনে আসবার চেষ্টা করব—এটা আমার মনোগত অভিপ্রায়।

সেই সঙ্গে চেষ্টা করব আগে যাই নি এমন কিছু কিছু নতুন

জায়গাও দেখে আসতে। এবার না হলেও ভবিষ্যতে যখন নতুন করে আবার লিখব তখন যাতে মেলাতে পারি। তার মানে, বছর কুড়ি পরেকার কথাও এখন থেকেই আমি ভেবে রাখছি! আমার বন্ধুরা বলবেন, লোকটা কম আশাবাদী নয় তো ? বেঁচে থাকলেও, তখন কি বাপু, তোমার চলবার শক্তি থাকবে ?

থাকুক না থাকুক, গেয়ে রাখতে দোষ কী ?

বিকেলে ফোন করে জানলাম বিকেলের ট্রেন নিশ্চয়ই ছাড়ছে। শুনে পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। তবু দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

রবিবারেও যে লোকাল ট্রেনে এত ভিড় হয় আমার ধারণা ছিল না। দাঁড়াতে তো হলই, তার ওপর ভিড়ের চাপে কাঁধের ঝোলাটা নিয়েই বেশি মুশকিলে পড়লাম। বগলের ওপর ফুলে-ওঠা গ্ল্যাণ্ডটা বেশ টাটাচ্ছিল।

মনটাকে অন্যমনস্ক রাখার জন্যে ভাবছিলাম, ছুটির দিনে এত লোক কোথায় যায় ?

কথাটা হেলাফেলার নয়। দুপুরের ট্রামে বাসে ভিড় দেখে প্রায়ই এ প্রশ্নটা মনে জাগে। দশটা পাঁচটা আপিসের বাইরেও বিস্তর কাজের লোক, ম্যাটিনির দর্শক, তীর্থযাত্রী, কর্মপ্রার্থী—এসব তো আছেই, কিন্তু তা বাদেও কত রকমারি তাগিদে যে মানুষকে ঘরের বাইরে বেরোতে হয় ব'লে শেষ করা যায় না। নইলে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ভিড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হতে কার আর সাধ যায়, বলুন !

বনগাঁ লাইনের এই লোকালের কথাই ধরা যাক। ছুটির দিনে কিসের এত ভিড় ? চাকরিবাকরি ব্যবসাপত্তর পড়াশুনো ছাড়াও মানুষের আছে সামাজিক জীবন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই এখন যে রকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাতে নেমন্তন্ন রক্ষা করা, অসুখ করলে খবর নেওয়া, পাত্রপাত্রী দেখতে যাওয়া—এসব ধরলে মানুষের ছুটির দিনের কাজই বা কম কী।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। তখন মনে হত বনগাঁ অনেক দূর। রেললাইনের দুপাশে ছিল জঙ্গল। লোকালয় কম চোখে পড়ত। স্টেশনে স্টেশনে অপেক্ষা করত ছই-ওয়ালা গরুর গাড়ি। শহরবন্দর বাদ দিয়ে সবটাই ছিল তখন অজ পাড়াগাঁ।

এখন দুপাশে একটানা লোকালয়। জঙ্গলের বদলে ফসলের মাঠ। এর প্রায় সবটা জুড়েই এখন পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষের বাস। আজ আর তাদের ছিন্নমূল বলা যায় না। নিজেদের তারা রোপণ করেছে নতুন জমিতে। গোটা এলাকা জুড়ে শুধু তাদের ঘরবন্ধন নয়, রক্তেরও সম্বন্ধ। ছুটির দিনে থাকে আত্মীয়কুটুম্বদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ তত্ত্বতল্লাশের দায়। তাছাড়া আছে আরও হাজার টান।

যেতে যেতে ভাবছিলাম বারীন তো এইদিকেই কোথায় যেন আছে। তাড়াতাড়িতে চলে আসায় ওর কোথায় ডেরা সেটা জেনে আসা হয় নি। মনটা খুঁতখুঁত করছিল। কে যে কখন কী করে কিছুই বলা যায় না। বারীনের সঙ্গে প্রথম আলাপ জেলখানায়। ভাল ফুটবল খেলত।

তারপর বেশ কয়েক বছর দেখা নেই। হঠাৎ দেখা হতে জানলাম বেশ কয়েক বছর এদেশেই ছিল না। কিছুদিন ফ্রান্সে, তারপর ছিল ইতালিতে। সিনেমাটোগ্রাফি শিখে এসেছে।

ক্যামেরার কাজে ওর খুব সুনামও হল।

তারপর একদিন শুনলাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন গ্রামে গ্রামে চাষীদের সেচের জল যুগিয়ে বেড়াচ্ছে।

এদিকের স্টেশনগুলোতে নামার চেয়ে ওঠার লোকই দেখছি বেশি। কাঁহাতক হাত উঁচু করে থাকা যায়। দুটো হাতই টনটন করছিল। মাঝে মাঝে ভাবছি—পেছন থেকে যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছে তার মধ্যে চেনা ছেলেপুলে কেউ নেই! তাহলে হয়ত পাকাচুলের কল্যাণে খানিকটা বসবার সুযোগ পাওয়া যেত।

হঠাৎ এক সময় পেছন থেকে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকল। গলা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি সত্যিই বারীন।

ব্যস, তখনই ঠিক করে ফেললাম ওর সঙ্গে গুমোতেই নেমে যাব। এত রাত্তিরে বনগাঁয় পৌঁছেও কোনো লাভ নেই। বন্ধুবান্ধবদের শুধু শুধু বিপদে ফেলা হবে।

বারীন যে গ্রামে যাবে, সেটা আর এখন ওর আস্তানা নয়। তবে ওদের একটা আপিসঘর আছে। রাত্তিরটা সেখানেই শুয়েবসে কাটানো যাবে।

বারীনের হাতে একটা টিনের সুটকেস। দেখে বেশ মজা লাগছিল।

এবার বনগাঁয় গিয়ে

থুড়ি। ভুল করে লিখেছিলাম গুমো। হবে ঠাকুরনগর।

একটা সাইকেল ধার করে ভোরবেলায় এসে ধরলাম বনগাঁর ট্রেন। পরে শুনলাম বিনয় থাকে শিমুলপুরে। কবি বিনয় মজুমদার। ওর বাড়ির প্রায় গা দিয়েই এলাম। আগে জানলে ওকে ডেকে তুলে সকালের চা খেয়ে আসা যেত।

ট্রেন এল ঠিক সময়ে। কামরাগুলো ফাঁকা ফাঁকা। সাজগোজ-করা তুটি মেয়ে চাঁদপাড়ায় নেমে গেল। মনের মধ্যে খচ্ ক'রে উঠল। এত ভোরে আসা মানে তো রাত কেটেছে বাড়ির বাইরে।

বছর চল্লিশ আগেও শিমুলপুর, মানিকহীরা, শিঞ্জন. ভাতুড়িয়া, রামচন্দ্রপুর, মহিষাকাঠি—এসব তল্লাটে মানুষজনের বসত ছিল কম। বেশির ভাগই ছিল বনজঙ্গল। খালনদী বিলবাঁওড়ে মাছ ধরত আদিবাসী পাড়ুইরা। এখন সেখানে গ্রামের পর গ্রাম। বলতে গেলে প্রায় ষোল আনাই পুবের মানুষ। এক সময়ে এসব ছিল বুনো শুয়োর শিকারের জায়গা। বন্দুক নিয়ে সায়েবসুবোরা আসত। দেশভাগের পরও মাঝেমধ্যে বাঘ দেখা গেছে। বাঘ মানেই কিন্তু রয়াল বেঙ্গল নয়। নেকড়ে কিংবা গো-বাঘাও বাঘ বটে।

এখন হয় ধান পাট আর গম। বৃষ্টিনির্ভর বলে রবিখন্দ তেমন ভাল হয় না। সব্জি চাষই বেশি।

গাছপালা থাকছে না। এদিকে যে কাঠের রমরমে ব্যবসা। ঘরবাড়ি তো কম হয় নি। তাছাড়া রাস্তা বাড়াবার জন্যে কাঠের

পুল আর সাঁকো। সেই সঙ্গে ঘরবাড়ি আর আপিসকাছারি সাজাবার আসবাব। ফলে, শেয়ালের ডাক আজকাল প্রায় শোনাই যায় না। গ্রামে প্রধান জ্বালানি পাটকাঠি। সেইসঙ্গে কাঠের উনুনের বদলে শুরু হয়েছে অগত্যা কয়লার উনুন।

একদিকে কলকাতা, অন্যদিকে রাণাঘাট—এই দুই রেলপথের জংশন বনগাঁ। রাণাঘাটে যাওয়ার রেল-ইঞ্জিন এখনও কয়লার। ফলে, সাবেকী ইঞ্জিনের সিটি আর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ভেঁপু—দুটোই এখন বনগাঁয় বসে শোনা যায়।

রাস্তায় আসতে আসতে নতুন জিনিস নজরে পড়ল: আইসক্রিমের হকার। দুধারে স্টলওয়ালাদের দোকানঘরগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে চাকা-লাগানো ভ্যান।

স্টেশনে এবার নোট বদল করার লোকদের তেমন হাঁকডাক শুনলাম না। রাস্তাতেও সাইকেল-রিক্সা বা ভ্যানে সীমান্তযাত্রী দেখলাম খুবই কম।

বনগাঁ যে বর্ডার এলাকা, রাস্তাঘাটে এখন আর সেটা তত স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশের লড়াইয়ের সময়কার বনগাঁর সেই গেল-গেল ভাব এখন আর নেই। রাস্তায় তখন ভিড়ে পা পাতা যেত না। অবস্থা এখন অনেক সুস্থির। সাজানো গোছানো দোকানপাটগুলো এখন চোখে পড়ে। রাস্তার লোকদের চেহারায় কিংবা হাঁটাচলায় অভাব-অনটনের ছাপ সে রকম দেখে-মন-খারাপ হওয়ার মত নয়।

সকালে স্টেশনে দাঁড়ালেই বোঝা যায় বনগাঁ থেকে যত লোক বেরিয়ে যায় তার চেয়ে আসে অনেক কম। এখানকার নিত্যযাত্রীরা সবাই চাকুরে কিংবা ভেণ্ডার।

সকালে যারা বনগাঁয় আসে তারা বেশির ভাগই সরকারী চাকুরে। কিছু আছে ছাত্র-অধ্যাপক, কিছু বেসরকারী ফার্ম বা ব্যাঙ্কের কর্মী। রাস্তায় যেতে যেতে দু পাশের সাইনবোর্ডের দিকে তাকালেই তা মালুম হয়।

তার ওপর বর্ডার টাউন। কাজেই তার নিরাপত্তার জন্যে রয়েছে বিস্তর খোলাখুলি আর লুকোছাপা ব্যবস্থা।

আজ থেকে এক যুগ আগে যাদের সঙ্গে শহরে আর সীমান্তে ঘুরেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল স্মাগলার। চোরাচালানের ব্যবসায় ভাঁটা পড়ায় অনেকেই এখন এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়েছে। কেউ বা দোকান খুলে থিতিয়ে বসেছে। তাদের কারো সঙ্গে এবার দেখা হল না।

তাদের কারও কারও মুখ এখনও মনে পড়ে। সমাজকর্মী আর সমাজবিরোধী—হালে এতুটো কথার খুব চল হয়েছে। যারা ঠিক চাকরি বা ব্যবসা করে না, চাঁদার টাকায় বা উঞ্ছবৃত্তি ক'রে যাদের জনসেবায় ব্রতী থাকতে হয় তাদের পেশার জায়গায় এখন 'সমাজসেবী' লেখার রেওয়াজ। আর চোর গুণ্ডা বদমাশ চোরাচালানী বা মস্তান—তারাই হল 'সমাজবিরোধী'।

আগের বার বর্ডারে এমন দু একজন স্মাগলারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যারা ছিল প্রাক্তন সমাজসেবী। খুব বদ্‌লোক ব'লে তাদের মনে হয় নি। ভদ্রলোক হয়েও যেমন অম্লানবদনে ঘুষ নেওয়া যায়—এও সেই রকম। স্মাগলিং তাদের কাছে ছিল জীবিকার অন্যতম উপায়। দায়ে পড়ে 'সমাজসবী' রাতারাতি 'সমাজবিরোধী' বনে গিয়েছিল। সুযোগসুবিধে পেয়ে 'সমাজবিরোধী' ছাপটা তুলে ফেলতেও আবার দেরি হয় নি।

একটা কথা। আচ্ছা, ঘুষখোরদের কেন আমরা 'চাকুরে' বলি—(অর্থনীতির ভাষায় যা 'সার্ভিস' বা 'সেবা'র পর্যায়ে পড়ে)? নেতারা কেন তাঁদের 'সমাজবিরোধী'র কোঠায় ফেলেন না?

পুরনো চোরাচালানীর জায়গায় এসে গেছে উঠতি নতুন লোক। সওদারও হয়েছে রকমফের।

সুপুরির ব্যাপারটা এখন একদম বন্ধ। থাকার মধ্যে আছে সোনা

আর কতকাংশে নিরেস পাট। তাছাড়া ঝক্কিঝামেলাও এখন অনেক বেশি। লোক পারাপারের ব্যবসাতেও এখন বেজায় মন্দা। হিঁয়াকা মাল হুঁয়া এখনও হয়, তবে ঢের বেশি রয়ে সয়ে। অতটা প্রকাশ্যে নয়। তলে তলে। আগে যেসব বিদেশী জিনিস আসত, বাংলাদেশের বিদেশী মুদ্রার ভাঁড় খালি হওয়ায় তাও আর আসে না। পাট আসে ওপারের সরকারী কর্মচারীদের পকেট ভারী করার জন্যে আর সোনা আসে বিদেশী চোরাচালানীদের পাঠাবার সুরাহার জন্যে। বনগাঁয় তাই ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে ওঠা সোনার দোকান। এমনিভাবে এক সময়ে গজিয়ে উঠেছিল কাপড়ের দোকান। কিছু অবাঙালী ব্যবসায়ী এসে তিরিশ হাজার টাকা সেলামি দিয়েও দোকান খুলতে কসুর করে নি। কিন্তু সীমান্ত বাম হওয়ায় অনেকগুলোই তার উঠে গেছে। এক সময়ে দেখা যেত পাঁচ সাতশো মেয়ে দিনে বার কয়েক ছেঁড়া উলিভুলি শাড়ি পরে আসছে আর যাবার সময় তাদের পরনে থাকছে নতুন কোরা কাপড়। চোরাচালানের এটাও ছিল একটা ধরন।

এই কারবারে বনগাঁর কোনো কোনো লোক এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। সেই 'তেনারা' এখন রকম রকম ব্যবসা ফেঁদেছেন। বাংলাদেশের লড়াইয়ের সময় শরণার্থীদের সেবায় প্রায় হরির লুটের মত এসে গিয়েছিল ছ' কোটি টাকা। এই সব টাকার বেশ বড় অংশ এখন কাঠের ব্যবসায়, করাতকলে, চিরুনি শিল্পে, বাস লরী-টেম্পোয় খাটছে।

দোকানে শখশৌখিনতার জিনিস এখন প্রচুর। মাঝে মাঝে আলোর ঝলসানিতে, লাউডস্পীকারে কান-ফাটানো চিৎকারে, কালো চাঁদির চাঁদার বহরে বোঝা যায় বনগাঁয় কারো কারো হাতে বিস্তর টাকা আছে। সেই জোরে তারা রাতকে দিন আর দিনকে রাত করছে।

টি-ভির অ্যাণ্টেনা চোখে পড়ল দু-চার জায়গায়। সারা শহরে

সব মিলিয়ে বোধহয় গোটা আটদশ। দোকান বাদ দিলে ফ্রীজ খুব কম বাড়িতে। বাড়ির গাড়ি দু-তিনটির বেশি নয়। ইচ্ছে থাকলেও সবাইকেই একটু রেখেঢেকে চলতে হয়। আয়করের নজর পড়লে রক্ষে নেই।

এম-এল এ অজিত গাঙ্গুলি বলছিলেন, এই বিপুল টাকায় বনগাঁ ছোট ছোট কলকারখানায় ভরে দেওয়া যেত। বাহানা তোলা হয় যে, এটা বর্ডার এলাকা—কখন কী হয়। আসলে তা নয়। সরকারী নেকনজর মিলল না এটা বাম-ঘেঁষা জায়গা বলে।

ঠিকেদারি করেন সুহাসবাবু। তিনি বলছিলেন, ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে সরকার বা ব্যাঙ্ক কারো কোনো গা নেই। অথচ কিছু কিছু শিল্প হতে পারে যার কাঁচামাল এখানে হাত বাড়ালেই মিলবে। যেমন পাটের ফেঁসো, পাটকাঠি আর গমের খড়। এসব দিয়ে অনায়াসে কার্ডবোর্ড, দড়ি, সুতোলি, প্যাকিং কাগজ হতে পারে।

সরকারকে কত বলা হয়েছে এখানে টেকনিকাল ইস্কুল খোলো, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট বসাও। আজও কিছু হয় নি। আদৌ যে হবে তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

যেটুকু হয়েছে, ঠেলায় পড়ে। যখন যা তখন তা। এইভাবে। ভিটেছাড়া হয়ে লোকে এখানে এসে শ'খানেক চিরুনির কল খুলেছে। তাতে কাজ পেয়েছে হাজার দুই বেকার। বাস্তুহারার চাই মাথা গুঁজবার ঠাঁই। কাজেই কাঠগোলা আর ইঁটখোলা জাঁকিয়ে বসেছে; এখন রাস্তাঘাট বাড়ছে, শহর-বন্দরের সঙ্গে গ্রামগঞ্জের গড়ে উঠছে ঘনিষ্ঠ যোগ। ফলে, বেশ কিছু লোক টাকা লাগাচ্ছে পরিবহণের ব্যবসায়। পারুক না পারুক, এখন ঢের বেশি লোক দেখে লক্ষ্মীলাভের স্বপ্ন। তাই মধ্যবিত্তের একাংশ বাঁধা-আয়ের চাকরির বদলে ঠিকেদারির দিকে ঝুঁকছে। এই ঠিকেদাররা শুধু বনগাঁ নয়, তার বাইরেও ব্লকে ব্লকে, এমন কি সি-এম-ডি-এ'তেও কাজ পাচ্ছে। সেইসঙ্গে গৃহপালিত ভাবও কমছে।

বর্ডার বলে নয়। বনগাঁর বড় মুশকিল এর লোকপ্রকৃতি নিয়ে। এর লোকসংখ্যার শতকরা সত্তর জন বাইরে থেকে আসা। এখানকার জীবনে এখনও তারা ঠিক শিকড়বদ্ধ নয়। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের মনের তার ঠিক একভাবে বাজে না। অথচ এই বহিরাগতরাই সংখ্যায় বেশি।

দেশ ভাগের আগে বনগাঁ মহকুমার বারো আনা বাসিন্দা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়। বাহান্নটার মধ্যে মাত্র ছ'টা ইউনিয়নে ছিল হিন্দু প্রেসিডেন্ট। এদেশে থেকে-যাওয়া স্থানীয় মুসলমানের সংখ্যা এখন শতকরা পাঁচে এসে ঠেকেছে। স্বাধীনতার আগে এটা ছিল মুসলিম লীগের একচ্ছত্র ঘাঁটি। পাশেই বসিরহাট। সেখানে অন্য ব্যাপার। জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সেখানে যেমন ঐতিহ্য তেমনি প্রভাব রয়েছে। বর্ধমান বাঁকুড়ার সঙ্গে এর অমিল আরও স্পষ্ট।

বনগাঁকে বুঝতে গেলে লোকপ্রকৃতির এই পার্থক্যগুলো মনে রাখতে হবে।

জীপে ক'রে যাচ্ছিলাম পাল্লায়। দুপাশে ফসলের ক্ষেত। কোথাও শ্যালো, কোথাও গভীর নলকূপ।

ডোল, শ্যালো, টি-আর (টেস্ট রিলিফ), কেস, ডেভ্লাপমেণ্ট—এমনি আরও কত শব্দ গ্রামে এখন মুখে মুখে চলছে। এর ফলে যে বাংলা ভাষার কেবল তাগত বাড়ছে এটা ঠিক নয়। ইংরিজির প্রতি দাস্যভাব, বাংলাকে অবজ্ঞা—এসবও আছে। শুধু সরকার নয়, আমরা দেশের লোকজনেরাও এ ব্যাপারে বোম-ভোলানাথ হয়ে বসে আছি।

রাস্তা দিয়ে কয়েকটা টেম্পো গেল। যেন মানুষের একেকটা কেল্লা। চাকা বাদ দিয়ে আর সব জায়গাতেই শুধু মানুষ। এমন ভিড় এককালে দেখেছি মফস্বলের ট্যাক্সিতে। কিন্তু ট্যাক্সি আর টেম্পো তো এক নয়। তার ফলে হামেশাই যেমন দুর্ঘটনা ঘটে তেমনি তা মারাত্মকও হয়। ভিড়ের কারণ হল, এ রাস্তায় বাস নেই। হাটুরে,

আপিসযাত্রী, ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে, মালের ব্যাপারী—সবারই শহরে যাওয়ার এই একমাত্র বাহন

খালের ওপর হবে কাঠের পুল। এম-এল-এ এসেছেন, বি-ডি-ও এসেছেন—তাঁরা কোদাল দিয়ে মাটি কেটে প্রকল্পের কাজ শুরু করবেন। এপারে ওপারে গ্রামবাসীরা সবাই খুশি।

আগে থেকে বলা-কওয়া ছিল। ভাণ্ডারখোলার এক বড় চাষীর বাড়িতে ঘিয়ে-ভাজা লুচির সঙ্গে ডিমের তরকারি আর মণ্ডামিঠাই। মাতব্বরদের বাড়িতে আমলারা পায়ের ধুলো দেবেন এটাই রেওয়াজ। 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

দেখলাম বাড়িতে গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট বসছে। ফেরার সময় রাস্তায় ফটো তোলা হল। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে তার ছবি। ভূমিহীনেরা বাস্তু পেয়েছে, জমি পাচ্ছে সেচের জল, গ্রামে তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র—এই রকম বহুমুখী অগ্রগতির খবর দিয়ে শহরে প্রদর্শনী হবে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কিংবা মনকে চোখ ঠারা নয় তো? তাহলে তো চমৎকার!

হালছাড়া শহর

পাল্লা থেকে গেলাম গণেশপুর। যেখানে রাস্তা ছিল না সেখানে রাস্তা হচ্ছে। গাঁয়ের লোকেরই তদারকিতে আর মেহনতে চওড়া রাস্তা হচ্ছে যাতে গাড়ি চলতে পারে। এর ফলে, গাঁয়ের ফসল চটপট বন্দরে পৌঁছবে। চাষীরা দুটো পয়সার মুখ দেখবে।

এ সত্ত্বেও দেখলাম দু-চারজন হায়-হায় করছে তাদের উঠন্ত সর্ষের ক্ষেতে কোদাল পড়েছে বলে। আর দু-একদিন সবুর করলেই তারা ফসল ঘরে তুলতে পারত। কাজ মুলতুবি না রেখেও একটু আগুপিছু করলেই সেটা সম্ভব হত। এক গোত্রের হয়েও কেন এই মমত্বের অভাব হল? অঙ্কুরেই এই বিজাতীয় মনোভাবের বিনাশ না হলে ভবিষ্যতে দুর্গতির একশেষ হবে।

ফেরার পথে একজন চাষী মরাকান্না কেঁদে জীপগাড়ি আটকাল। তার অন্তঃসত্ত্বা বউকে পাশের বাড়ির এক বউ এমন মেরেছে যে এখুনি সে মরে যাবে। যাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসে যা বললেন তাতে বোঝা গেল লোকটা খুব বাড়িয়ে বলছে। মেরেছে ঠিকই। তবে খুনের দায়ে ফাঁসি যাবার মত ব্যাপার নয়।

দেখুন, ভুল করে এখনও কে কার সঙ্গে লড়ছে! বনগাঁ শহরে জেল-খানার পাঁচিল। তার পাশ দিয়ে গেছে দূরপাল্লার রাস্তা। সেই রাস্তায় লোকে কোর্ট-কাছারি, আপিস-ইস্কুলে যায়। কিন্তু ওখান দিয়ে যেতে গেলে নাকে কাপড়চাপা দিতে হবে। নইলে দুর্গন্ধে বমি

উঠে আসবে। কেন? না, পাঁচিল আর রাস্তার মাঝখানের ছোট্ট ফাঁকটুকুতে আছে লাশ-কাটা ঘর। ওপরদিকটা শুধু জাল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ময়না তদন্তের অপেক্ষায় গাদা মেরে ফেলে রাখা হয় লাশ।

এ মহকুমার যেখানে যত অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, সেই লাশ এখানে আসে। ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা, ট্রেনে কাটা যাওয়া, গাড়ি চাপা পড়া, খুন হওয়া—একটা না একটা রোজই লেগে আছে। কাজেই মড়াপচা দুর্গন্ধ থেকে শহরবাসীর রেহাই নেই। কবে থেকে শোনা যাচ্ছে কুলিং-চেম্বার হবে। এখনও তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীণ ডাক্তার সলিল মুখুয্যে দুঃখ করে বললেন, স্বাধীনতার পর এত বছর কেটে গেল, বনগাঁ শহরে আজও জলকল হল্ না। ইছামতীর অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। স্রোত হারিয়ে এখন বদ্ধ জলা। শহরে অসম্ভব লোক বেড়ে যাওয়ায় পরিস্রুত জলের যোগান দরকার। জলাভাব ছাড়াও স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটা খুব জরুরি। তাছাড়া এখানকার জলে লোহার ভাগ খুব বেশি। যেমন জল চাই, তেমনি চাই জলনিকাশেরও সুব্যবস্থা।

বড় বড় গাছের গায়ে খুব বেশি করে চোখে পড়ে যাত্রার পোস্টার। শহর বলুন, গ্রাম বলুন—সর্বত্রই এক দৃশ্য। এছাড়া আছে অসংখ্য শখের যাত্রাপার্টি।

সিনেমা আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবার মতন কোনো আধুনিক মঞ্চ নেই। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে কমিটি হয়েছিল। রবীন্দ্র-ভবন তৈরির জন্যে হাজার হাজার টাকাও উঠেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শেষ অবধি কিছুই হয় নি।

খেলাধুলোর জায়গা খুব কম। ছোটদের জন্যে কোনো পার্ক নেই। নদীটার সংস্কার করলে তার ধার বরাবর শহরবাসীদের বেড়াবার কিংবা ব'সে হাওয়া খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা হতে পারে।

কিন্তু সবার আগে দরকার এ শহরকে ভাঙাগড়া করবার একটা সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা। শহরবাসীদের এসব ব্যাপারে কেমন যেন একটা হালছাড়া ভাব। কবে একজন উদ্যোগী মহকুমা শাসক আসবেন সবাই যেন সেই আশায় বসে আছে।

স্বাধীনতার আগে কিন্তু এমন ছিল না। চাঁদা তুলে লাইব্রেরি হত, টাউন হল হত—সবই নিজেদের চেষ্টায়। সমস্ত ব্যাপারে সব উদ্যোগ লোকে সরকারের হাতে সঁপে দিত না।

এমন কি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও যে কতখানি কী করা যায় তার নমুনা দেখেছিলাম ম্যানিলায়। শহরের মধ্যে একটা বিরাট প'ড়ো জায়গা ছিল। ঘাস ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না। এক সাংবাদিক খবরের কাগজে নিয়মিতভাবে তাঁর এক কলম চালাতেন। সেই কলমে তিনি এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বসলেন যে, ঐ প'ড়ো জায়গায় তিনি শিশুদের জন্যে একটা ফুলের বাগান করতে চান। কিভাবে তা সম্ভব হবে, কত টাকা লাগবে—তার পুরো ছক তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর লেখা প'ড়ে উৎসাহিত হয়ে লোকে টাকা পাঠাতে লাগল।

সেই টাকায় তৈরি ফুলের বাগান ম্যানিলায় আজ এক দর্শনীয় স্থান। সেখানে একটা ক্যান্টিন আছে। সেখানে কাজ করে মূক-বধির ছেলেমেয়ে। বাগানে যারা মালীর কাজ করে তারা সবাই ছাড়া-পাওয়া জেলের কয়েদী। এক তো হাতেনাতে কাজ, তার ওপর ফুল আর শিশুদের সঙ্গ—এ দুয়ের প্রভাবে তাদের ভেতর থেকে অপরাধপ্রবণতা চলে যায়।

চাঁদা তোলার মুরোদ আমাদেরও কম নেই। শুধু একটু যা সদুদ্দেশ্যের ওয়াস্তা।

ডাক্তারখানায় বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। এদিকে আমার ভাবখানা যেন এক চুমুকে গোটা শহরের ভূতভবিষ্যৎ জেনে ফেলতে চাই ডাক্তারবাবুর পাশে বসেছিলেন যশোর থেকে আসা প্রবীণ

উকিল হরিনাথবাবু। আমার রকম দেখে ওঁরা দুজনেই নিশ্চয় মনে মনে হাসছিলেন।

আমারও তো বয়স হচ্ছে। কাজেই কথা ফুরোতেই চায় না।

অসবর্ণ বিয়ে? তা তো হচ্ছেই। ও নিয়ে আগে যত গজালি হত এখন আর তত হয় না। বাপমা-রা মনে মনে নিশ্চয়ই চান না। কিন্তু ঘটে যায়। গোড়ায় মন কষাকষি। পরে মিটেও যায়। ছেলেমেয়েরা এখন মেলামেশার অনেক সুযোগ পায়। এক ট্রেনে যায় আসে। এক জায়গায় পড়ে, একসঙ্গে কাজ করে। গ্রামের দিকেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে। স্বামী অসচ্চরিত্র মাতাল কিংবা মারধর করে। বিয়ে হতে না হতে স্ত্রীর সন্তান হল। এইসব নানা কারণে।

ইছামতীর ওপর জলে-ভাসা পুরনো পুল। নতুন ব্রীজ হলেও এখনও এ জায়গাটা ঠিক তেমনি জমজমাট। হাটের দিনে এসব জায়গায় লোকের ভিড়ে পা পাতা যায় না। আগের মত বাংলাদেশ থেকে তত মাছ আর আসে না। যেটুকু আসে হাতে হাতে। কেননা ওদেশে এখন যা দরদাম তাতে মাছ বেচে লাভ আছে।

এবার রওনা হবার সময় ঠিকই করে গিয়েছিলাম ডাকবাংলায় থাকব। এর আগে যখন 'ডাকবাংলার ডায়রি' লিখেছিলাম তখন ডাক মুছে গিয়ে চোখের সামনে ছিল শুধু 'বাংলা'। এবার পাছে তার পুনরাবৃত্তি হয়, তার জন্যে বাংলার আগুপিছু ডবল 'ডাক' শিরোনামে বেঁধে নিয়েছি।

কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও বনগাঁয় একবার ডাকবাংলায় আমাকে উঠতেই হল।

আগে থেকে বলা-কওয়া ছিল। এসে উঠলাম রাত দশটায়। শীতের রাত্তির। তার মানে, অনেক রাত। চৌকিদারকে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে ঘরে গেলাম। চমৎকার ঘর। একমাত্র দোষ টেবিল ল্যাম্প নেই। কলকাতার এত কাছে ব'লে এখানে লোকে তেমন এসে ওঠে ব'লে মনে হয় না। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো

প্রাণী নেই। সারাটা দিন টো টো করে ঘুরেছি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কাল বার হব গ্রামের দিকে। .ক যেন বলেছিল, ওদিকে যখন যাচ্ছেন মোল্লাহাটির ডাকবাংলায় থেকে যাবেন। বনজঙ্গলে ঘেরা খাসা জায়গা।

অপুদুর্গার জগৎ

এক যুগ পরে বনগাঁ থেকে আবার সেই চাকদা-র বাস।

বাসে দিব্যি বসার জায়গা পাওয়া গেল। রোগা চেহারার একটি ফর্সা ছেলে কমলালেবু ফেরি করছিল। তার সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ। মনে হল, রক্তহীনতা তার গায়ের রঙে যে পাণ্ডুরতা এনেছে তাতে তাকে একটু অস্বাভাবিক রকমের ফর্সা দেখাচ্ছে। তার ঠিক পিঠোপিঠি যে ছেলেটা ধূপকাঠির ঝোলা কাঁধে উঠেছিল, তার গায়ের রং কালোকোলো, হাড়গুলোও চ্যাটালো। বিক্রির ব্যাপারেও দেখা গেল সে অনেক বেশি পটু। ওদের কথার আড়ে বোঝা গেল দুজনে বন্ধু। হয়ত দুজনেই ইস্কুলে পড়ে কিংবা পড়ত। যখন ওদের হেসে-খেলে বেড়াবার বয়স, তখনই সংসারের ভার ওদের বইতে হচ্ছে।

এসব দেখে দেখে মনের মধ্যে কেমন যেন ধাঁটা পড়ে গেছে। তবু একটা ভাবনা মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করে। সবাই খেয়ে পরে সুখে আছে—এমন দিন কি দেখে যেতে পারব না?

শ্রীপল্লীর মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে পড়লাম। আমি আর অপু। গ্রাম সফরে অপু আমার সঙ্গী।

অপু এই নামটা হঠাৎ মনে হতেই আমার স্মৃতিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আসলে শ্রীপল্লী নয়, এ তো বারাকপুর। পথের পাঁচালির অপুর জায়গা। বিভূতিভূষণের ভিটে।

এখন ডাক বদলেছে। বারাকপুরের চেয়ে শ্রীপল্লীরই এখন

নামডাক বেশি। বারাকপুরের বদলে শ্রীপল্লীর মোড় বলাটাই লোকের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। খবর পেয়ে মহানন্দ এসেছিল আমাদের নিতে। এক রিকশাতে আমরা তিনজন। ডানদিকে ইছামতী নদী।

এ অঞ্চলও পুবের মানুষই এখন সংখ্যায় বেশি। বারাকপুরের পুরনো বাসিন্দারা অনেকেই মরে হেজে গেছে। কিংবা গ্রামের পাট উঠিয়ে প্রবাসেই ঘর বেঁধেছে।

আমরা সোজা গিয়ে উঠলাম মাস্টার মশাই ফণী চক্কোত্তির বাড়িতে। উঁচু দাওয়া, মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। বাঁশের গায়ে ঝোলানো থেলো হুঁকো। যা আজকাল গাঁয়ের দিকেও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। হুঁকো কল্কে তামাক টিকে—কে আর অত ভজকট করে। পকেটে বা ট্যাঁকে বিড়ি রাখো, ফস করে ধরাও, টান মেরে ফেলে দাও—ব্যস, মিটে গেল।

মহানন্দর মুখ দেখে মাস্টার মশাই ঠিক বুঝেছিলেন, ওর খাওয়া হয় নি। কোনো কথা না শুনে ওকে স্নান করে খাওয়ার জন্যে অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

এত অভাব-অনটনের মধ্যেও এই স্নেহ মমতাগুলো গ্রামদেশে তাহলে টিঁকে রয়েছে। দেখে ভাল লাগল। আধুনিকের যুক্তিতে আমার এই ভাল লাগাটা হয়ত উচিত হল না।

ফণীবাবু অবশ্য এসব যুক্তি তর্কের উর্দ্ধে। উনি বরিশালের বাঙাল যে।

ওঁর একটা বড় গর্ব বিভূতিভূষণকে উনি চিনতেন বিভূতিবাবু কোন্ ঘাটে স্নান করতেন, কোন্ গাছতলায় বসে লিখতেন সমস্তই ওঁর নখদর্পণে। এ গ্রামের মানুষজন, মাঠ, নদী, গাছপালা সমস্তই তিনি তাঁর নানা রংতে ফুটিয়ে তুলে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখে গেছেন। ফণীবাবু বললেন, তাঁর ছিল একটাই দোষ—বড় বেশি সঞ্চয়ী ছিলেন। আধ-খাওয়া বিড়িও পকেটে রেখে দিতেন। ধরে

ফেললে সলজ্জভাবে হেসে বলতেন, ফেলব কেন? আরেকবার তো খাওয়া চলবে। তবে ফণীবাবুকে তাঁর নিজের বই দিতে কখনও কার্পণ্য করেন নি।

ফণীবাবু হাত বাড়িয়ে দেখান—ঐ দেখুন, সেই কুঠির মাঠ। বিভূতিবাবুর বেড়াবার প্রিয় জায়গা। কাটাখালির পুল, বেলডাঙা, নতিডাঙা, সুন্দরপুর, মোল্লাহাটি—সবই পাবেন তাঁর বইতে। তবে সমস্তই খুব বদলে গেছে।

এখনও রয়েছেন বিভূতিবাবুর বাল্যবন্ধু পতিতবাবু। বিভূতি-ভূষণের জীবনকথা তাঁর কাছ থেকেই বেশি জানা যাবে। কিন্তু শরীরও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেবার বারাকপুর গ্রামে গিয়ে-ছিলাম সন্ধ্যের পর। ফলে, হাতলণ্ঠনের আলোয় কিছুই তেমন নজরে আসে নি।

এবার দিনের আলোয় দেখলাম মাটিতে মিশে-যাওয়া বিভূতি-বাবুদের আদত মাটির বাড়ির ভিটে। তার সামনে পাকা দালানেরও জীর্ণদশা। সরকার নাকি গেয়ে রেখেছে স্মৃতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে।

চিরকালের সেই হচ্ছে হবে!

শুধু তো বিভূতিভূষণ নন, বনগাঁর প্রাতঃস্মরণীয়দের মধ্যে আছেন দীনবন্ধু মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয়ভাবে তাঁদের স্মৃতি জাগিয়ে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও হয় নি। এসব হতে করতে আরও কতদিন লাগবে কে জানে।

রাস্তায় যেতে যেতে ফণীবাবুকে জিগ্যেস করলাম, এটা কী ফুল?

বললেন, বনতুলসী। এই ফুল বিভূতিভূষণের খুব প্রিয় ছিল।

তারপর হাসতে হাসতে সেইসঙ্গে যোগ করলেন, আমাদের বরিশালে এর কী নাম জানেন? বরিশালে বলে 'পেত্নীবন'।

হয়ত আবছা আলোয় বনতুলসীর সাদা সাদা ফুল থান কাপড়ের

মত দেখায়। সেইসঙ্গে যদি হাওয়া থাকে, তাহলে পেত্নী ভাবা অসম্ভব নয়।

জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা কোন্‌টা ঘেঁটুফুল বলুন তো ?

ফণীবাবু বললেন, ঘেঁটুফুল এখানে আর পাবেন না। সেবার বানে ডোবার পর থেকে ঘেঁটুফুল ঝাড়েবংশে শেষ। এ গ্রামে এখন আর ঘেঁটুফুল নেই।

অপুত্‌র্গার জগৎ কত যে বদলে গেছে ভাবাই যায় না।

বন্যার ঠিক পরে পরেই সেবার আমি এসেছিলাম। শ্রীপল্লী সমবায় সমিতি লঙ্গরখানা খুলে গ্রামের লোকদের মরণদশা থেকে বাঁচিয়েছিল। আমি গিয়ে পৌঁচেছিলাম লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ার উৎসবের দিন।

ফণীবাবুকে বললাম, চলুন সমবায় সমিতিটা একবার দেখে আসি।

সমবায় সমিতি ? সে তো কবে উঠে গেছে। কেন, শোনেন নি ?

কাছাকাছি বাজ পড়লেও আমি বোধহয় এতটা চমকাতাম না। সমবায় উঠে গেল ? গ্রামের লোকে বাঁচাতে পারল না ?

শ্রীপল্লী সমবায় সমিতির গমগমে অফিসঘরটা এখনও আমার চোখে ভাসছে। কানে লেগে আছে ডায়নামোর ভটর ভটর আর ধানভাঙা কলের ঘর্ঘর শব্দে গোটা গ্রামের প্রাণের স্পন্দন। সমিতির ছিল ইস্কুল, মাতৃমঙ্গল, সবজিক্ষেত, ইঁটখোলা, ট্র্যাকটর, বাস, কামারশালা, ছুতোরবাড়ি—আজ তার কিচ্ছু নেই ?

কিচ্ছু নেই। শুধু কায়দা করে ইস্কুলের জন্যে বিঘে তিনেক জমি বাঁচানো গেছে। শুনে কী যে মন খারাপ হয়ে গেল বলার নয়। একে নেতৃত্বের কোঁদল। তার ওপর চুরি করে করে সমিতিকে ফোঁপরা করে দিয়েছিল। না উঠে উপায় আছে ? সমিতিকে চুলোয় দিয়ে কিছু চাঁই ধরনের লোক নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে।

কপাল পুড়লো গ্রামের লোকের। এরপর সমবায়ের নাম শুনলে লোকে কানে আঙুল দেবে। ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়?

কবরেজ মশাই এখন চায়ের দোকান খুলে বসেছেন। বয়স হল একাশি। দেখে কে বলবে?

এলাম এক যুগ পরে। তবু আমাকে দেখে অনেকেই চিনতে পারল। সেই লঙ্গরখানার সময় এসেছিলেন না?

বাইরের লোক এসব অঞ্চলে খুব বেশি তো আসে না। কাজেই কেউ এলে-টেলে লোকে তাকে সহজে ভোলে না।

এতক্ষণে মনে পড়ল বিভূতিবাবুর পড়শী ইন্দুবাবুর কথা। ইন্দুবাবু? তিনি মারা গেছেন। ইস, তাঁর মেয়ে হাসপাতালে নার্সের কাজ করত, ভারি সুন্দর গানের গলা—তার সঙ্গে দেখা করে আসা হল না।

নতিডাঙার আজাহার মণ্ডল যে বেঁচে থাকবে না, সেটা আমার হিসেবের মধ্যে ধরাই ছিল। তখনই তো বলেছিল তার বয়স তুই কম একশো। সে কি আজকের কথা? মাদার মণ্ডলও যে মারা গেছে সেটা কবরেজ মশাইয়ের কাছে শুনলাম। চায়ের দোকানে বসে আজাহারের সেই নীলচাষের আমলের গল্প কখনও ভুলব না। তেলের সের তিন আনা আর সাতহাতি ধুতিও তিন আনা। ছেলেবেলায় নীলের ভ্যাটে পড়ে যাওয়ার গল্প। তার ঈদের চাঁদের মত সাদা দাড়ি আর ফোকলা দাঁতের ভুবনভোলানো হাসি!

মাদার মণ্ডল বলেছিল মহাজনদের কাছে করজা করে চাষীদের সর্বস্ব হারানোর গল্প।

দেখার মত বরডার

ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তি হওয়ার পর গরিবের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা হচ্ছে। সে গল্প বনগাঁ শহরে বসে শুনেছিলাম একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মুখে :

গ্যাঁড়াপোতা অঞ্চলের গাইনপুর গ্রাম। চাষীরা মাঠে জল পায় না। বেশির ভাগ জমিই চলে গেছে মহাজনদের হাতে। ব্যাঙ্ক থেকে গিয়ে বলা হল ধারে শ্যালো আর পাম্পসেট দেওয়া হবে। কাউকে এককভাবে নয়, যৌথভাবে। কিন্তু চাষ করতে হবে আধুনিক কায়দায়। সেই শুনে টাউটরা লোকের কান ভারী করতে লাগল— খবরদার, ব্যাঙ্কের খপ্পরে গেলেই কিন্তু মারা পড়বে। এমনিভাবে বছর দুই গেল। সামনাসামনি হ্যাঁ-হুঁ, পেছন ফিরলেই টাউটদের ফাঁদে পা। প্লট ছকা ছিল, কো-অপারেটিভ হলেই জল যেত। হল না টাউটদের জন্যে।

তখন অন্য উপায় বার করা হল। গাঁয়ে ছিল কিছু লেখাপড়া-জানা যুবক। গ্রামের অর্থনীতির উন্নতি হলে তাদেরও বাঁচার সুরাহা হয়। ওদের একটা ক্লাব ছিল উদয়ন সংঘ। এই ক্লাবের ছেলেদের বুঝিয়ে ব্যবস্থা হল, যে জমিতে শ্যালো বসবে তার যে মালিক সে ক্লাবের পাণ্ডাকে তিন শতক জমি লিখে দেবে। সেই জমি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক শ্যালো টিউবওয়েল দিল। চারপাশ জুড়ে পঁচিশ বিঘে জমি ঘণ্টায় চার টাকা হারে সেচের জল পেল। পরের পর কী ফলন হবে তাও ঠিক করে দেওয়া হল। সেচের ফলে দুশো টাকা বিঘের জমির

দাম পাঁচ-ছ গুণ বেড়ে গেছে। এক ফসলা জমি তিন ফসলা হচ্ছে। রোজগার বাড়বে আড়াই থেকে তিন গুণ। যুবকদের যে পাওা জল দেয়, মাসে সে দুশো টাকা আয় করবে। গ্রামে তিনশো লোক। অধিকাংশই গরিব চাষী আর ক্ষেতমজুর।

এ গ্রামে চব্বিশ পঁচিশ জন ঋষিদাস। বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে। তাদের ছিল অবর্ণনীয় অভাব। মহাজনদের কাছে একশো টাকা ধার করলে দিনে এক টাকা হিসেবে তাদের সুদ দিতে হত। টাকা নিয়ে এখন ব্যাঙ্ককে তারা সুদ দিচ্ছে মাসে এক টাকা। সুদে আসলে শোধ হয়ে যাচ্ছে ছ মাসে। সহজে পুঁজি জুটে যাওয়ায় তাদের রোজগার বেড়ে গেছে তিন চার গুণ। নিয়মিতভাবে তাদের কাছ থেকে ঋণের টাকা তুলে নিয়ে উদয়ন সংঘ প্রথমে ডাকঘরের সেভিংসে জমা রাখে। তারপর থোক তুলে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসে। জেলেরাও এমনিভাবে সমবায় গড়ে শুধু যে মহাজনদের কবল থেকে বাঁচছে তাই নয়, জীবনে আশার আলো দেখছে।

অন্যদিকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে অবস্থার ফেরে শেষ অবধি ভিটেমাটি উচ্ছন্নে যাওয়ার ছবিও আছে। হাজার হোক, মহাজন হল মানুষ। তার মন যদিবা ভেজানো যায়, ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে মন কোথায়? নিয়মই সর্বেসর্বা।

বনগাঁর অলকবাবু এই প্রসঙ্গে একটা ভাল কথা বলেছিলেন। রপ্তানীকারকদের বেশ ভালমত ভরতুকি দেওয়া হয়। চাষীদের বেলাতেও এই রকম কেন করা হবে না? ফসল বাড়লে খাদ্য কেনার বৈদেশিক মুদ্রার অনেকখানি সাশ্রয় হবে। গ্রামের দারিদ্র্যও তাতে বেশ খানিকটা ঘোচানো যাবে।

একটা কথা। কোথাও বিশ-ফোঁটা কর্মসূচী সংক্রান্ত একটা প্রচারপত্রও কিন্তু শহরের বাইরে এসে চোখে পড়ে নি। লরি বা বাসের গায়ে

ইংরিজি লেখা। বাংলায় যেটুকু, তাও আঁতে ধরে না। কথার সঙ্গে কাজের মেলবন্ধন কই? যেন শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

ভাবতে ভাবতে কাটাখালির পুল পেরিয়ে এলাম বেলডাঙার বাগ্দী পাড়ায়। লোক তেমন বাড়ে নি। অভাবে পড়ে চলেও গেছে অনেকে। দেখেছিলাম এক যুগ পরেও সবার সেই এক অবস্থা। কারো জাল নেই। ময়না-কাঁটার বদলে এখন লোহার বড়শি—তফাত এইটুকু। বাঁওড়ে ঝাঁঝি। ঘুনী দিয়ে আর বড়শি ফে'ল মাত্র দেড়শো আড়াইশো গ্রাম মাছ পায়। তাতে আর কী হয়? মাঠে জন খেটে পায় আড়াই টাকা রোজ। পাটের সময় মাত্র মাসখানেক রোজ ওঠে পাঁচ টাকায়। ছেলেপুলেরা একজনও পড়ে না। আরামডাঙার কিছু পয়সাওয়ালা চাষী বাঁওড়ের একটা অংশ হাতিয়ে নিয়ে মাছের ভেড়ি করেছে।

বাগ্দী পাড়ার যে ছেলেটা সুন্দরপুরের রাস্তায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল তার বেশ সুঠাম গড়ন। সতেরো আঠারো বছর বয়স। লেখাপড়া একদম শেখে নি। জিগ্যেস করলাম—আচ্ছা, নিরাপদ সরকারকে তো দেখলাম না। বলল, মারা গেছেন। উনি আমার বাবা। আগের বার বেলডাঙায় ঘুরেছিলাম নিরাপদর সঙ্গে। নিরাপদ মারা গেছে?

এখন বাগ্দী পাড়ায় বাংলা লিখতে পড়তে পারে দেড় খানা লোক। একজন পুরোপুরি। আরেকজন আধাআধি। দুজনেরই বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। যে পুরো পারে সে দুঃখ করে বলেছিল—ছেলেপুলেদের কত বলি একটু পড়া-লেখা শেখ। কিন্তু ওরা খেলবে তবু পড়বে না। মনে পড়ে গিয়ে হাসি পেল: লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে। ওরা কি সেটা জানে?

আমি যেবার এখানে এসেছিলাম তারপর এখানে একটা দুঃখের ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কিছু লোক মারা পড়ে, কিছু ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। এর পেছনে ঘৃণাবিদ্বেষ আর স্বার্থের

দ্বন্দ্ব ছাড়াও দু তরফেই ছিল শত্রুপক্ষের উস্কানি। তার ফল হয়েছে এই যে, অনেকের মন ভেঙে গিয়েছে। চলেও গেছে অনেকে।

বনগাঁর পক্ষে এটা একটা বেখাপ্‌পা ব্যাপার। আগে কখনও হয় নি। পরেও নয়।

পাকিস্তান হওয়ার পর শুধু হিন্দু নয়, নিরাপত্তার অভাবে খ্রীস্টানরাও দল বেঁধে চলে এসেছিল। বনগাঁ শহরে তো খ্রীস্টানদের দুটো আলাদা পাড়া গড়ে উঠেছে। এক পাড়ায় ক্যাথলিক, অন্য পাড়ায় প্রোটেস্টান্ট। জাত ঠেলাঠেলির ব্যাপার এদের ভেতরেও আছে। একটু টোকা দিলেই ধরা পড়ে। যারা শুয়োর পালে, কাছিমের মাংস বেচে তাদের সম্পর্কে বলা হয় ওরা এসেছে নিচু জাত থেকে। তাদের আলাদা গির্জা। নইলে এখানকার দেশী খ্রীস্টানেরা সবাই গরিব। হয় রিক্সা চালায়, নয় জন খাটে। অনেকেরই গলার কণ্ঠীতে ঝোলানো থাকে ক্রসচিহ্ন। সন্ধ্যের পর খোল করতাল বাজিয়ে বাংলায় যীশুর নামকীর্তন করে : যীশু বিনা কেহ নাই এ সংসারে, এই মহা পাপের দায় কে উদ্ধার করে ?

গির্জার ভারপ্রাপ্ত এক তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উদ্বাস্তু হয়ে আসেন নি। বনগাঁয় এক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ছেলে। বি এ পাশ করে সরকারী চাকরি নিয়েছিলেন। খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থ পড়ে মনে ভাবান্তর আসে। খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন।

শুনে তাঁর এক সহপাঠী পরে আমাকে বলেছিল—আসলে কী জানেন ? একটি খ্রীস্টান মেয়েকে ভালবেসেছিল, সেই টানেই ও খ্রীস্টান হয়। তাছাড়া এ চাকরিতে ওর সুখসুবিধে বিস্তর। ধর্ম বদলে বরং ওর লাভই হয়েছে।

সে তো হতেই পারে। কিন্তু যাই হোক ছোকরাটিকে ভারী সদালাপী আর সজ্জন বলে মনে হল।

বেলেডাঙা নামেই বোঝা যায় বালিতে ভর্তি এখানকার মাটি।

দেখলাম বাঁওড়ের ধার থেকে কোদাল দিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। গ্রামের বাইরে চালান যাবে।

গাড়ির রাস্তায় গোড়ালি-ডোবানো ধুলো। বাঁদিকে ছোট রাস্তা গেছে সুন্দরপুর নতিডাঙার দিকে।

সুন্দরপুর কলোনিতে উঠোনে বসে উঠন্ত মুলো আঁটি করে বাঁধছিলেন মনোমোহন পাল। অভাবে বেহাত হয়ে গেছে সরকারের দেওয়া দু বিঘে জমি। আছে শুধু বাস্তুটুকু। এখন জন খেটে খান। মুখ ফুটে বলতে পারেন নি আসলে রিক্সা টানেন। পরে মহানন্দর কাছে শুনলাম। ঢাকার রায়পুরায় আগে দোকান ছিল। মুদিখানা আর হাঁড়িপাতিলের।

কলোনির সবার অবস্থাই মোটামুটি এক। যারা গুছিয়ে নিতে পেরেছে তারা পয়সা করেছে অন্য রাস্তায়।

চন্দ্রনাথ নাহার খোঁজ করলাম। আমাকে শুধরে দিয়ে একজন বললেন—নাথ নয়, শেখর। তিনি তো মারা গেছেন। তাঁর তিন ছেলে। বড়টি কলকাতায়। গঞ্জের হোসিয়ারিতে মেজোটি সেলাইয়ের কাজ করে। ছোটটি রুটি এনে পাইকারি বেচে।

মনোমোহন বললেন, চাষ হবে কী? আগে ছিল খড়ের মাঠ। মাটিভর্তি শুধু উঁই। কিচ্ছু হবার নয়।

জমি বেচার ব্যাপারটা মহানন্দ আমাকে বুঝিয়ে বলল। সরকারের কাছ থেকে যে শর্তে পাওয়া তাতে এ জমি বেচা যায় না। যার জমি নামে তারই আছে। তবে চাষ করছে অন্য লোক। এটাই এখানে বেচার ধরন।

শুধু এখানে কেন, যেখানেই জমির মালিক অভাবী—সেখানেই যার পয়সা আছে সে বেনামীতে সেই জমি ভোগ করছে।

একদল ছেলেমেয়ে এসে ভিড় করেছিল। জিগ্যেস করলাম,

তোমরা পড়ো ? সবাই ঘাড় নেড়ে জানাল—না। কেউ পড়ে না। ফোর পর্যন্ত বিনা মাইনেয় পড়ানো হয়। তারপর পড়াশুনোয় ইতি।

আগের বার এসে যাদের দেখেছিলাম দুগ্ধপোষ্য, এখন তারা জোয়ান। কিন্তু কারো চোখেমুখে আশার কোন আলো দেখলাম না।

আসার আগে শ্রীপল্লীর জুনিয়র ইস্কুলে খানিকক্ষণ বসতে হয়েছিল চা না খাইয়ে তাঁরা ছাড়বেন না। ফণীবাবুকে বলেছিলাম, মোল্লাহাটি ডাকবাংলায় একটা খবর পাঠিয়ে দিলে হয় না ? সাইকেল পাওয়া গেল না। ফণীবাবু নিজেই পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন।

ঘোরাঘুরি সেরে আমি আর অপু বোঁচকা-বুঁচকি ঘাড়ে পিঠে নিয়ে মোল্লাহাটির দিকে পা বাড়ালাম। বাঁওড়ের রাস্তায় মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। দেখলাম ওঁর তো পা নয় যেন দুটো রণপা। সাইকেলকেও হার মানায়। এর মধ্যেই মোল্লাহাটি গিয়ে উনি নাকি সব বলে কয়ে এসেছেন।

আমরা যখন মোল্লাহাটি পৌঁছোলাম, তখন সন্ধ্যে হয় হয়। অনেক উচু ডাঙা জায়গা। পাশ দিয়ে গেছে ইছামতী নদী আগে এখানে ছিল সাহেবদের খুব বড় নীলকুঠি। পরে ঘোষেদের জমিদারি।

এ গাঁয়ে যারা থাকে, জাতে তারা বুনো। পাইক লেঠেল হিসেবে প্রজাদের ঢিট করার জন্যে নীলকর সায়েবরা বাংলার বাইরে থেকে তাদের আনিয়েছিল। নীলকরদের পর তারা হল জমিদারদের হাতধরা। আজ তাদের ভারি দুরবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্রোতে এখনও তারা নিজেদের ঠিক মিলিয়ে দিতে পারে নি।

যাকে ডাকবাংলা বলা হয়, আগে ছিল সেটা নীলকুঠি।

ডাকবাংলার চেহারা দেখে পিলে চমকে গেল। বাইরের বারান্দায় একগাদা কুচো-কাচা। একমাথা চুল আর একমুখ দাড়ি নিয়ে যে দুখছুটে লোকটা একগাল হেসে আমাদের স্বাগত জানাল তাকে বৈরাগী বলে মনে হয়েছিল। নাম তার সাধু। বারান্দায় যাদের

দেখলাম ওরা সাধুরই সন্তানাদি। ডাকবাংলা বলতে একটা লম্বা হলঘর। তার পাশে এক চিলতে একটা ঘর। আগে রান্নাবান্না হত। সাধু তাড়াতাড়ি উঠে হলঘরের মেঝেতে একটু ঝাঁটা বুলিয়ে দিল। অনেক দিনের জমানো ধুলোগুলোকে চটিয়ে দেওয়া ছাড়া তাতে আর কিছু বিশেষ এগোল না। আসবাবহীন ন্যাড়া ঘর আর খালি মেঝে। এই হল মোল্লাহাটির ডাকবাংলা।

বেশ বুঝলাম আমরা এসে পড়ায় সাধুচরণ খুব মুশকিলে পড়বে। ঠাণ্ডা এখানে বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। একেই তো গায়ে দেবার মত কিছু নেই, ছেলেপুলে নিয়ে ফাঁকা বারান্দায় শুলে একেবারে মারা পড়বে। আমি বললাম, তোমরা বড় ঘরে শোও, আমরা ছোট ঘরে থাকব। সাধুর মুখে হাসি ফুটল।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সঙ্গে একটা টর্চবাতিও নেই। কালীপদ সরদার দয়া করে আমাদের জন্যে একটা কুপি এনে দিলেন। দেখে বুঝলাম এর তেল ফুরোতে বেশি দেরি হবে না। কাজেই একটু রয়েসয়ে আলো খরচ করতে হবে। আর সেই সঙ্গে শুয়ে পড়তে হবে চটপট। অপু ছেলেমানুষ। ক্ষিধেয় ওর এতক্ষণে ভোঁচকানি লাগার কথা। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এখানে এমন দোকান নেই যেখানে যাহোক কোনো খাবার মিলতে পারে। যার সঙ্গে ফণীবাবুর কথা হয়েছিল সেই বেচারামকে খুঁজে বার করা হল। বেচারাম এল একখণ্ড তালগুড় নিয়ে। বলল, এত দেরিতে খবর পেলাম যে আর কিছু জোগাড় করা গেল না। জানেনই তো। এ একদম অজ পাড়াগাঁ। সাধু আপনাদের রুটি তৈরি করে দেবে। ঐ দিয়েই রাত্তিরটা চালিয়ে নিন। শুনে ধড়ে প্রাণ এল। রুটি আর গুড়। রাত্তিরে আমার পক্ষে ঐ যথেষ্ট।

কালীপদ সরদারের জামাই নানকুবাবু সে রাত্তিরে আমাদের খুব দেখাশোনা করেছিলেন। দেহাতী লোক। বাংলায় এখনও আড় ভাঙে নি। আগে কাজ করতেন ব্যারাকপুরের কাছে কোনো এক কলে।

কাকে যেন টাকা ধার দিয়ে শেষ অবধি এখানে জমিজায়গা পান। বাইরের লোক বলে নাকি খুন হওয়ার ভয় ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে-থা করে শেকড় গজিয়ে নিয়েছেন।

ভাগ্যিস সঙ্গে কম্বল এনেছিলাম। যা শীত! একটা শপ পাওয়া গিয়েছিল মেঝেতে পাতার। নানকুবাবু তার ওপর জোর করে তাঁর গায়ের চাদরটা পেতে দিয়ে গিয়েছিলেন। নাকেমুখে গুঁজে তাড়াতাড়ি চিৎপাত হলাম। ঘুম আসছে না। ঝনকাঠে মাথা আর দেয়ালে পা। পিঠে ঠাণ্ডা লাগছে। ঘরের মধ্যেও বেশ কনকনে শীত। সাধুকে হেঁকে বললাম, গান শোনাও। সাধু খঞ্জনী বাজিয়ে শুধু হরে কৃষ্ণ হরে রাম করতে লাগল। তার গলা ঠিক গানের নয়।

একটু তন্দ্রা মত আসছে আর তারপরই শীতের কাঁপুনিতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কী করা যায়! মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম বনগাঁ শহরে বসে এ কদিনে কার কাছে কী শুনেছি না শুনেছি :

শহরে ছেলেরা অধিকাংশ বেকার হয়েও চাঁদা তুলে, যাত্রা করে, ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে, আরও নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে ক্লাবের বাড়ি হাঁকিয়েছে। অনেকের পরনেই বেলবটম আর রঙিন চিত্র-বিচিত্র করা জামা। অনেক পাড়াতেই গড়ে উঠেছে তাসা পার্টি। গীটার শিখতে অনেক ছেলে কলকাতায় যায়। বিলিতি সুরের দিকে তাদের খুব টান! যেমন গান, তেমনি স্টেনগান। সেয়ানে সেয়ানে মাঝে মাঝে লড়ে যায়।

গাঁয়ের টাকা শহরে শুধু পোদ্দারিতে এখন আর খাটছে না। ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে। ইউ-বি'র চার শাখায় এক বছরে জমা পড়েছে দু কোটি টাকা। লগ্নীর অভাবে সে টাকা চলে যাচ্ছে হেড অফিসে।

এইসব শোনা কথাগুলো ছাড়া-ছাড়াভাবে মনে পড়ছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। এক ঘুমে রাত কাবার।

উঠেই দাঁতনকাঠি হাতে নিয়ে এক দৌড়ে শ্রীপল্লী। কাটাখালির

পুল পেরিয়ে কবরেজ মশাইয়ের দোকানে চা আর তেলেভাজা সাঁটিয়ে আবার সেই চাকদার ফেরত বাসে বনগাঁ শহর।

ফিরে এসে নিত্যানন্দবাবুকে বললাম, যাবার আগে পেট্রাপোলের রাস্তাটা একটু ঘুরে এলে হয় না ?

একটা রিক্সা ধরে নিত্যানন্দবাবু আর আমি তখনি বেরিয়ে পড়লাম।

যেতে যেতে রাস্তায় দেখি এক সায়েব বোষ্টম। গন্ধে গন্ধে চলে গেলাম হরিদাসপুর। বাংলাদেশের প্রায় সীমান্ত। সেখানে যবন হরিদাসের থান। গিয়ে শুনলাম সেখানে নাকি আমেরিকান ভক্তদের টাকায় মস্ত বাড়ি হবে। আরও কিসব যেন হবে মায়াপুরের সঙ্গে এ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

মাযাপুর তবু সহ্য হয়। কিন্তু হরিদাসপুর যে একেবারে সীমান্তের গায়ে !

ফেরবার সময় দেখলাম রিক্সার পর রিক্সা জুড়ে সায়েব মেমের দল চলেছে। পেট্রাপোল পেরিয়ে তারা যাবে বাংলাদেশ।

সন্দেহ নেই, বনগাঁ সত্যিই এক দেখবার মত বর্ডার।

কাছেই বজবজ

বছর শেষ হয়ে এল তাই মন বলল, যাও হে—শেষের সুখটানটা দিয়ে এস বজবজে।

বজবজ! সে তো বাসে উঠলেই হুস ক যাওয়া যায়। কিংবা ট্রেনে। এত কাছে বলেই বোধহয় যাব-যাব করে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। কতদিন যে ও-রাস্তা মাড়াই নি।

টাঁকশাল পেরিয়ে খেয়াল হল—আরে, বেহালাতেই তো আসা হয় নি আজ কতকাল। রাস্তা যে এর মধ্যে এত চওড়া হয়েছে, ট্রাম-লাইন যে ডানদিকের বদলে বাঁদিকে ঘুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে—আমার অসাক্ষাতে এমনি অনেক কিছু ঘটে গেছে দেখে একটু অস্বস্তি হল। তার মানে, আমি আর আজকাল সব কিছুর ওপর তেমন নজর রাখতে পারছি না।

আগে যেখানে কুকুর-দৌড় হত, এখন সেখানে সরকারী হাউসিং এস্টেট।

বাস বকুলতলার দিকে মোড় নেওয়ার আগে ডানদিকে ইণ্ডিয়া ফ্যানের ঘুঘু-চরা ভিটে। এক সময় চৌপর দিন চৌপর রাত গোটা পাড়া মুখর হয়ে থাকত যন্ত্রের শব্দে। কাজ করত হাজার হাজার মজুর। এখন সেখানে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

বিরাট পড়ো জমিটার দিকে তাকিয়ে এক ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অথচ জানেন—পুরনো ইণ্ডিয়া ফ্যানের কাছে অন্য কোনো ফ্যান লাগে না।

আমার ঠিক পাশেই গ্রামবাসী এক ছোকরা মুখ শুকনো করে বসে ছিল। শুনলাম ওর বোতাম আঁটা শার্টের ভেতরের বুকপকেট থেকে একগোছা নোট বাসের ভিড়ে কোনো পকেটমার নিঃসাড়ে তুলে নিয়েছে। একজন বললেন, হাতসাফাইয়ের তারিফ করতে হয়।

বকুলতলায় এক সময়ে আসতাম। আমার এক বন্ধু বাসা নিয়েছিল। সে সময় এত কলকারখানা, এত লোকের বাস ছিল না। এখন ঘরবাড়িতে সমস্ত ফাঁকা মাঠ ঢেকে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ল কাগজে পড়েছি, বকুলতলার মাটি খুঁড়ে তেল না গ্যাসের যেন হদিশ মিলেছে সে কি এই বকুলতলা? জিগ্যেস করব করব করে আর করা হল না।

কিছুদূর যাবার পরই নিরঙ্কুশ গ্রাম আর গঞ্জ। শিবরামপুর, গণিপুর, ব্যানার্জির হাট। হঠাৎ হঠাৎ সেকেলে কোঠাবাড়ি। মন্দির আর বাঁধানো ঘাট। তারপর ডাকঘরের মোড়।

পরের বার গেলাম অন্য বাসে তারাতলা হয়ে। জিঞ্জিরাপোল পেরিয়ে বাঁদিকে চলে গেছে আছিপুর অবধি টানা রাস্তা।

পঁচিশ বছর আগে বজবজ থেকে এ সব রাস্তায় আমার ছিল নিত্য যাওয়া-আসা। তখন বাস এসে থামত একবালপুরে। এখন আখড়া-সন্তোষপুর পর্যন্ত রাস্তার দু ধারে নতুন নতুন অনেক কল-কারখানার পত্তন হয়েছে দেখা যায়।

কিন্তু মহেশতলা, বাটা-নুঙ্গি আর পারবাংলা পেরিয়ে যেই সারেঙ্গাবাদে পড়লেন, দেখবেন, তারপর যে-কে সেই। শুধু বজবজ স্টেশনে যেতে সবেধন নীলমণি কারবন ফ্যাক্টরি। যতটুকু উন্নতি হয়েছে সমস্তই যেন বজবজকে বাইরে রেখে।

এখন শোনা যাচ্ছে, বজবজ থেকে নাকি নতুন রেলের লাইন টেনে নিয়ে যাওয়া হবে নামখানা অবধি।

৭৭-এ বাসটা ডানদিকে ঘুরে বাটানগর একবার পাক দিয়ে

আসে। আগে ঠিক মোড়ের মাথায় খাজুরাহোর পায়ে কাঁটাবেঁধা নারীমূর্তির যে আঁকা ছবিটা থাকত, সেটা অনেককাল নেই। তার বদলে ইংরিজিতে লেখা : বাটার লড়াই খালি পায়ের বিরুদ্ধে। মাটির সঙ্গে সম্পর্কের এই অভাবের কারণ জুতো নয় তো !

বাসের বডিতে, দোকানের সাইন বোর্ডে চোখ খুলে তাকালেই অনেক খোরাক মেলে। আজকাল তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সরকারী প্রচার। এক পেট্রোল পাম্পের হাতায় প্রকাণ্ড হোর্ডিঙে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—'জরুরী অবস্থার সাফল্য গুলি'।

এসে নামলাম চড়িয়ালে। রেজওয়ানের রুটি-পাঁউরুটির কারখানা, মনে হল, আগের চেয়ে ভাল চলছে। একটা সময় গিয়েছিল যখন ময়দার অভাবে কারবার উঠে যেতে বসেছিল। এবার বড়দিনে বানানো হয়েছিল কেক। বাজারে পড়তে পায় নি এমন চাহিদা ছিল। বড়দিনের সঙ্গে কেকের সম্পর্কটা ক্রমশ বেশ ফলাও হয়ে উঠছে।

কিন্তু ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় পা দিয়েই বুঝলাম এ অঞ্চলের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। গ্রামের মধ্যে পাকাবাড়ি হয়েছে দুটো-তিনটে। তার কারণ, মাটির বাড়ি করতে এখন যা খরচ তার চেয়ে পাকাবাড়ি তৈরির খরচ খুব বেশি নয়। সংসারে লোক বাড়ছে, কাজেই সেইমত মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়েরও তো দরকার। যাদের পুরনো মাটির বাড়ি, তাদের অনেকেরই ঘর এখন ভেঙে পড়ছে। বেশির ভাগ ছেলেই বেকার।

ভালোর মধ্যে, গ্রামে জলের কল এসেছে। কয়লাসড়কে হয়েছে পৌরসভার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা। সেখানে ডাক্তার আর ওষুধ দুটোই পাওয়া যায় বিনা পয়সায়।

ঘুরে ঘুরে পুরনো লোকজনদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। মোল্লা-বাড়ির বুড়োর এন্তেকাল হয়েছে সে আজ অনেকদিন। ইলিয়াস তাঁর ছেলে। দমকল থেকে রিটায়ার করে এখন বাড়িতে এসে

আছে। নুজু আর হাশিম। আমরা থাকতে—এই টুকু টুকু ছিল। নুজু এখন ইস্কুলের মাস্টার। হাশিম চলে গেছে বাংলাদেশে।

এই কুড়ি বছরের মধ্যে যে পরিবর্তনটা হয়েছে, তার বেশির ভাগটাই মানুষের শরীরে। নাবালকেরা সাবালক, মাঝবয়সীরা বুড়ো আর বুড়োদের অনেকেই গিয়েছে টেঁসে। নইলে মানুষের অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় নি। ঘরে ঘরে আগেও যে অভাব ছিল, এখনও তাই আছে।

কী মিষ্টি দেখতে ছিল, ছোট্ট সকিনা। তার সেই চকচকে ভাব চলে গিয়ে কি রকম মিইয়ে গিয়েছে। কোলে তার পনেরো দিনের ছোট্ট বাচ্চা। এই নিয়ে তার চারটি হল।

বিয়ের জল গায়ে পড়ার পর একবার দেখে গিয়েছিলাম সালেমনকে। কী সুন্দর যে দেখতে হয়েছিল কী বলব। ছোটবেলায় বেড়ার গায়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার লেখার সময় ও ভারি বিরক্ত করত। ওর রাজ্যের প্রশ্নের আমাকে জবাব দিতে হত।

দেখি উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে আছে সালেমন। ওর কোলেও তিন মাসের ময়না। এটা নিয়ে ওর ছ'টা হল। জিগ্যেস করলাম, তোর বাবা কোথায় রে? মারা গেছে। ওর বাবা ছিল পাগল বাবরালি। ছোট থেকে দিদিমার কাছে মানুষ। বুড়ি এখনও বেঁচে। ছানি-কাটা চোখে মোটা কাঁচের চশমা। ভাল দেখতে পায় না। আমার গলার স্বর শুনে ঠিক চিনল।

আসলে মুখে মুখে বিকৃত হওয়া নাম সালেমন। তাতে কার কী যায় আসে?

এই সালেমনই ছোটবেলায় বারান্দায় উঁকি দিয়ে আমাকে জিগ্যেস করেছিল, 'কী করো তুমি?' ও জানতে চেয়েছিল আমি পেট চালাই কেমন ক'রে। বলেছিলাম, 'আমি লিখি।' শুনে

অবাক হয়ে বলেছিল, 'বা রে, লিখে কেউ টাকা পায় নাকি? লেখাপড়া করতে গেলে তো টাকা দিতে হয়।'

খুব একটা মিথ্যে বলে নি, হাড়ে হাড়ে আজ টের পাচ্ছি।

এই সালেমনকে নিয়ে, পাগল বাবরালিকে নিয়ে আমি এক সময়ে লিখেছি। সে সব এরা কেউই পড়ে নি। সালেমন নয়, সকিনা নয়, জমিলা নয়। পড়তে জানলে তো পড়বে! জমিলার জুটেছিল এক বুড়ো জাহাজী বর। তার ছিল কড়া পর্দার শাসন। তাই বিয়ের পর জমিলার সঙ্গে আর আমার দেখাই হয়নি। এখন সে আছে নোয়াখালির কোন্ গাঁয়ে।

গোলবানু, ছোটবেলায় যাকে আমি পাগলবানু বলে ক্ষ্যাপাতাম, সেও তো এখন বাংলাদেশে। সে নাকি ঘরসংসার নিয়ে এমন ন্যাতা-জোবড়া হয়ে পড়েছে যে বাপের বাড়িতে দুটো দিন বেড়িয়ে যাবারও সময় পায় না।

বানুর মেয়ে সোনা থাকে দিদিমা কবিরনের কাছে। সেও তো কম বড় হল না। নাইনে পড়ে। বানুর দাদা আহম্মদের এখন এক ছেলে এক মেয়ে।

সাজ্জাদদার বাড়ির দাওয়ায় বসে এই সব দেখি, আর পুরনো কত কথা সব মনে পড়ে যায়। যাকে এক সময়ে কোলে নিতাম, সেই জাহানারা মাথায় এখন কত বড় হয়েছে। এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বজবজ দেখায়। নাতিপুতি হয়ে গেলেও ইমানির বউ কালো কিন্তু প্রায় সেই রকমই আছে। তেমনি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আর ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে ঘোরা।

পুরনোকে ঝালাই করে বেশিদূর এগোনো যায় না। কী নতুন আমাকে তা দেখতে হবে।

কয়লা সড়কে রকমারি নতুন মুখ। দেখেই বোঝা যায়, কেউ তারা স্থানীয় নয়। বাইরে থেকে আসা। বস্তিলাইনে থাকে। বজবজের

যে একটা বিশেষত্ব ছিল—অধিকাংশই বাঙালী মজুর—এখন আর সেটা থাকছে না।

পঁচিশ বছর আগে আমরা যখন বজবজে ছিলাম তখন চটকলে অবাঙালী মজুর ছিল তিনভাগের একভাগ। এখন সেই হার বদলে হয়েছে চারভাগের তিনভাগ। চটকলের মালিকরা সবাই অবাঙালী বলে যে এটা ঘটেছে আমার তা মনে হয় না। এখানকার জীবনে যাদের শেকড় নেই, তাদের সহজেই মুঠোয় পুরে যেমন ইচ্ছে তাল-গোল পাকানো যায়। সেইসঙ্গে যাতে দরকার হলে দু-হাতে তালি বাজানো যায়।

পাঁচ বছর আগেও এদিককার ছ'টা চটকলে মজুর ছিল ত্রিশ-বত্রিশ হাজার। এখন সেই সংখ্যা অর্ধেকেরও কমে এসে ঠেকেছে। বজবজ যে শিল্প এলাকা, এটা সবাই জানে। আর তার প্রাণ হল চটশিল্প। এই শিল্পের জোয়ারভাঁটার ওপর গোটা বজবজের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে।

আজ হয়েছেও তাই। চটকলগুলো ধুঁকছে বলে সারা বজবজ চোখে অন্ধকার দেখছে। বাজারে আর তেমন ব্যাপারীর ভিড় নেই। দোকানে বিক্রিবাটা কম। ছেলেরা মাইনে দিতে পারছে না, ফলে মাস্টারদের হাড়ির হাল। বজবজের গোটা অর্থনীতিই আছাড় খাবি খাচ্ছে।

তেলের ডিপো তো আগেই ঘা খেয়েছে। বড় বড় ট্যাংক এখনও আকাশে মাথা তুলে আছে। কিন্তু তার বেশির ভাগই শূন্যগর্ভ। পাইপ লাইনে এখন প্রায় সব তেলই গিয়ে জমা হচ্ছে মৌরীগ্রামে। তেল এখন টিমটিম করছে বজবজে।

কোমাগাতামারুর স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে গিয়ে গঙ্গার ধারে ভারত রিফাইনারিজের একজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আগে ছিল বার্মা শেল।

বললেন, তিন-চার বছর আগেও এখানে সপ্তাহে অন্তত দুশোটা

করে তেলের জাহাজ আসত। এখন মাসে একটা আসে কিনা সন্দেহ। বাষট্টি সালেও ট্যাংক-লরি ছিল ছাব্বিশটা। এখন মাত্র চারটে। তাও সবদিন থাকে না। মৌরীগ্রামে চলে যায়। আঠারো শো-র জায়গায় এখন মাত্র দুশো চল্লিশ জন মজুর, দু শো-র জায়গায় মাত্র আশী জন কেরানি। তাও তো ধরুন, যত লোক আছে তত কাজ নেই।

এটা ঠিকই, তেলের ডিপো না সরিয়ে উপায় ছিল না। হলদিয়ার যে বন্দর আর বারাউনির যে তেলের পাইপ—দুটোই গঙ্গার ওপারে।

সুতরাং তেলের দিক দিয়ে বজবজের মোক্ষম মার না খেয়ে উপায় ছিল না।

আর চটকলের ব্যাপারে? কলের কথায় পরে আসছি। তার আগে মানুষ।

বজবজ মিলে ড্রয়িং ডিপার্টে চোদ্দ বছর ধরে কাজ করছেন বীরেন প্রামাণিক। গোড়ায় একটা মেশিনে একজন লোক; এই-ভাবে কাজ হত। তারপর ধাপে ধাপে লোক কমে আর মেশিন বেড়ে এখন একজন লোককে দেখতে হচ্ছে তিনটে মেশিন। পেনিয়ন বাড়িয়ে দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে মাথাপিছু দ্বিগুণ। মজুরি কিন্তু ডবল হয় নি। আগে ছিল দেড়শো মজুর, এখন কমিয়ে চল্লিশ করা হয়েছে।

স্পিনিং-এ জোড়া ফ্রেম হওয়ার পর মাথাপিছু উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে মজুরের সংখ্যা কমে এখন অর্ধেক।

ভরতি নলী তুলে নিয়ে খালি নলী পরানো যাদের কাজ, সেই ড্রয়িং কুলিদের এখন দুখানার বদলে চারখানা মেশিনে কাজ যোগাতে হচ্ছে।

সেলাইঘরে আগে শুধু মেয়েরাই কাজ করত। এখন ছেলেরাও করে। সাত-আট মাস আগেও ছদিনে তিরাশি বানডিল মাল দিলে ইনসেনটিভ বোনাস মিলত দু টাকা চার আনা। এখন বাহানা করছে

রোজ কমপক্ষে চব্বিশ বানডিল মাল দিতে হবে। নইলে বসে যাও। কারো পক্ষে ষোল-আঠারো বানডিলের বেশি মাল সেলাই সম্ভব নয়। তাদের বলা হচ্ছে চাই তিরিশ-চল্লিশ বানডিল। না পারলে নিজের খরচে আধিয়া ধরে এনে কাজে লাগাও। আধিয়াদের দিতে হবে চার আনা বানডিল। আট ঘণ্টার জায়গায় ষোল ঘণ্টাও খাটতে হয়।

চায়ের দোকানে হঠাৎ দেখা হল গণেশ যশোয়ারার সঙ্গে। ক্যাজুয়াল মজুর। তার কাজ ছিল মেশিনে সেলাই-ফোঁড়াই। এক বছর আগে আট ঘণ্টায় ষাট বানডিল মাল সেলাই করতে হত। এখন বরাদ্দ হয়েছে একশ বানডিল। বলল, পারছিলাম না। পারা সম্ভব নয়। ফলে, গত আড়াই মাস ধরে তার কাজ নেই।

গোটা চটশিল্প জুড়েই আজ এই এক চেহারা। হাজারে হাজারে ছাঁটাই হয়েছে। বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে কাজের বোঝা। যাতে না করতে পেরে লোকে বসে যায়। কারো টুঁ শব্দ করার উপায় নেই।

সুইপারদের আগে ছিল চোদ্দ টাকা রোজের পাকা চাকরি। এখন তাদের অন্যান্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে ঠিকেদার লাগিয়ে পাঁচ টাকা রোজের ফুকো লোক দিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করানো হচ্ছে। কিছু না করে ঠিকেদার পাচ্ছে লোকপিছু তিন টাকা।

বদলিওয়ালা ছাঁটাই করে স্থায়ী লোকদের ঘাড়ে কাজের বোঝা বাড়ানো, ডেলি রেট-এর বদলে পিস রেট চালু করা—এখন এটাই হয়েছে রেওয়াজ।

এখনও যারা পেটের দায়ে মুখে রক্ত তুলে খাটছে, তাদের সবার মুখেই শুনলাম এক কথা—স্যার, মরে যাচ্ছি।

বজবজের অসুখ

স্যার, মরে যাচ্ছি—এই কথাটা কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না। চটকলের কোনো ছাঁটাই-হওয়া নয়, এখনও কাজে বহাল-থাকা এক মজুরের কথা। দুর্বহ বোঝায় শিরদাঁড়াগুলো বেঁকে যাচ্ছে।

একজন প্রবীণ কংগ্রেসসেবীর সঙ্গে কথা বললাম। তিনিও এই জুলুমের কথা অকপটে স্বীকার করলেন। বললেন, তেলের ডিপো তো গেছেই : বাকি ছিল চটকল, তাও তো যাওয়ার দাখিল। বজবজের হয়েছে ভাগের মা গঙ্গা পায় না অবস্থা ; সব মাথা আর সব হাত এক না করতে পারলে বজবজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ছাঁটাই আর কাজের বোঝা চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে শাসানো হচ্ছে —এখন জরুরি অবস্থা। টুঁ শব্দ করলেই—

একজন তরুণ কংগ্রেসকর্মী বললেন—দেশের অবস্থা ফেরাবার জন্যেই তো জরুরি অবস্থা। মালিকরা করছে তার ঠিক উল্টো।

বজবজে চটকলের পত্তন হয়েছিল আজ থেকে তা একশো বছর আগে। প্রথমে চটকল আর অনেক পরে তেলের ডিপো, রেলের লাইন, জাহাজের জেটি, পাকা রাস্তা, বিজলি বাতি, শহর বাজার সমস্তই সেই সূত্রে। গাঁয়ের লোকে ভিটেমাটি খুইয়ে হয়েছে কুলিমজুর। কেউবা আধা-মজুর আধা-চাষী হয়ে এখনও দুনৌকোয় পা দিয়ে রয়েছে।

মাঝারি অবস্থার লোকজনেরা কেউ হয়েছিল ঠিকেদার আড়ত-

দার, কেউ কোমপানির কেরানি মুনশি। পাইকার আর খুচরো দোকানদার, হেকিমবদ্যি, এমনকি সুদখোর কাবলিওয়ালারাও মাছির মত এসে ভিড় করেছিল। জেটি হওয়ার সূত্রে চোরাচালানির ব্যবসাটাও বেশ জমে উঠেছিল। বিলিতি মদ থেকে শুরু করে বিদেশি ফ্রিজ অবধি এখানে গস্ত করা যেত।

এসব অঞ্চলে এই সেদিনও কোমপানিগুলোরই ছিল একচ্ছত্র রাজত্ব। সরকার ছিল দূর অস্ত্। সেই ধারা ঘুরেফিরে অল্পবিস্তর এখনও চলছে।

সায়েবরা এখন আর নেই। কিন্তু এখনও রয়ে গেছে বড়দিনে ডালি দেওয়ার রেওয়াজ। কোমপানিগুলোও চেষ্টা করে, ফুলবিল্বপত্র ধোঁয়ার গন্ধ যেখানে যা দেওয়ার দিয়ে, দেও-দেবতাদের খুশি রাখতে।

চটশিল্পের নাকি আজ খুব কাহিল অবস্থা। কিন্তু তার জীবনের বেশির ভাগটাই যে গেছে সুদিন, সেটা চেপে যাওয়া হয় কেন? সব শিল্পের মধ্যে যখন চটকল সবচেয়ে বেশি পয়সা কামিয়েছে, তখন শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে চটকলের মজুররা পেয়েছে সবচেয়ে কম মজুরি। কোটি কোটি টাকা মালিকরা এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলেছে। আজ তারা মায়াকান্না জুড়ে মজুরদের বলছে তাদের দুরবস্থার শরিক হতে।

এই সেদিন অবধি চটকল আর তেল ডিপোর ছিল রমরমা অবস্থা। দেশের লোক চুলোয় যাক, বজবজের লোকেরাই বা তাদের কাছ থেকে কী পেয়েছে? পেয়েছে শুধু ধোঁয়াধুলো আর রোগ-ব্যাধি। ইস্কুল না, কলেজ না, ক্লাব না, হাসপাতাল না। কিছু আত্মসুখী বড়লোক আর কিছু দালাল। নতুন কোনো শিল্প না, গবেষণাগার না, কারিগরি বিদ্যালয় না।

বজবজে নতুন বাড়ির মধ্যে সরকারী টাকায় তৈরি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। যেখানে আগে মাঠ আর ডোবা-পুকুর ছিল। এখন আর ঠিক নতুন বলা যায় না। হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। বাসিন্দারা বেশির ভাগ বজবজের বাইরের চাকুরে।

চাকুরেরা বেশির ভাগই যে ডেলিপ্যাসেঞ্জার, সকাল সন্ধ্যে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালেই তা মালুম হয়।

ইচ্ছে ছিল কিছু সরকারী লোকজনদের কাছ থেকে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানব। আমার কপাল খারাপ। একে বড়দিনের মন-উড়ু ভাব। তার ওপর শিয়রে ক্রিকেট। কাউকে ধরতে ছুঁতে পারলাম না।

ইউ বি ব্যাঙ্কে গিয়ে যাকে পেলাম বৎসরান্তিক হিসেব নিয়ে তিনি ব্যস্ত। এখানকার উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা নাকি তাঁদের নেই। এ নিয়ে জরিপ-গবেষণাও তাঁরা করেন না। তাঁদের বারুইপুরের আপিসে হয়ত খোঁজখবর মিলতে পারে।

তার কারণ, বজবজ হল শিল্পাঞ্চল। ওঁদের উন্নয়নের কাজ চাষবাসের এলাকায়। কিছু খুচরো দোকানীকে লোন দেওয়া হয়েছিল। সে টাকা আর উশুল হয় নি।

সাবেকী শিল্প খুইয়ে ফেলছে বজবজ। নতুন আর কোনো শিল্পও গড়ে উঠছে না। অথচ নামটা থাকছে শিল্পাঞ্চল। নামের বালাইয়ের জন্যে অন্যদিকে কোনো উন্নয়নের সাহায্যও জুটছে না।

বজবজ মিলের গেটের সামনে সেই চায়ের দোকানটা দেখলাম ঠিক তেমনই আছে। জিগ্যেস করলাম, 'কেমন চলছে?' এক গাল হেসে বলল, 'খুব ভাল।'

শুনে একটু চমকে গেলাম। পরে জানলাম মিলের অন্য গেটটা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সেখানকার পাঁচ ছটা চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়ে এদিকের এই একটি দোকান ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। কয়লা সড়কের রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম অবিকল নমাজডাঙার মাঠে দেখা সেই একই দৃশ্য। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে না গিয়ে রাস্তায় বসে গেছে ছোট ছোট বোতলে বিস্কুট লজেঞ্চুস আর মুড়ির মোয়া বেচতে। কাজ গিয়ে কিংবা কাজের ঠেলায় বাপদের কণ্ঠাগত প্রাণ। ছোটরা যে যা পারে করছে।

রাস্তায়, দোকানের বেঞ্চিতে, বাড়ির রোয়াকে দলে দলে লোক। কাজ চলে গিয়ে তারা বেকার। এমন দৃশ্য বজবজে আগে দেখেছি একমাত্র হরতালের সময়। তবে এও একরকম হরতালই বটে। মজুর-দের নয়, মালিকদের।

শুনলাম হপ্তাবাজার অনেকদিন উঠে গেছে। এখন সেখানে মোষের খাটাল। মিলের গায়ে পুকুরের দিকটা থেকে ভটর ভটর আওয়াজ শুনে তাকালাম। কিসের আওয়াজ?

দেখছেন না দমকল! ফুকোনলীর গুদামে আগুন লেগেছিল, নেবাচ্ছে।

সকলেরই গলার স্বর খুব স্বাভাবিক। মনে পড়ল একটু আগে বড় রাস্তায় ঢং ঢং করে বাজিয়ে একটা দমকল আসতে দেখেছিলাম। অগ্নিকাণ্ড হলে লোকে সাধারণত উৎসুক হয়ে ছুটে যায়। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম ও ব্যাপারে কারো কোনো তাপ উত্তাপ নেই। যেন কিছুই হয় নি এমনি একটা ভাব।

ফুকোনলীর গুদামে আগুন লাগার কথা বলছেন। ও তো এখন নিত্যিকার ব্যাপার। হবে নাই বা কেন, বলুন—মেশিনে তেল দেওয়ার পাট উঠে গেছে। তাই মেশিন গরম হয়ে গিয়ে ফুকো-নলীতে আগুন লাগে।

চটকলের পুরনো মেশিনগুলো এমনিতেই হয়ে গেছে ঝরঝরে। মালিকরা এতদিন ধরে কম টাকা তো কামায় নি। কিন্তু এখনও দেখবেন সেই মান্ধাতার আমলের মেশিনপত্র। কম উৎপাদনের কথা তুললে হয় মজুরদের ঘাড়ে, নয় সরকারের ওপর তারা দোষ চাপায়। বাংলাদেশের ওজর তোলে। গরুর গাড়ি চালিয়ে তারা দেবে মোটর গাড়ির সঙ্গে পাল্লা।

নিজেদের ট্যাক ভারি করার ব্যাপারে দেশিবিদেশি মালিকে কোনো তফাত দেখা যায় নি। চাষীরা পাটের দাম পায় নি। মজুররা পায় নি বাঁচার মত মজুরি। কিন্তু মালিকের লাভ আকাশ ছুঁয়েছে।

আজ যখন তারা লোকসানের বাহানা তুলছে, তখন পুরুষপরম্পরায় লাভ করার ব্যাপারটাও .তা তোলা দরকার।

সত্যি বলতে কি, বজবজকে আজ নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার।

হারানদা, অতুলদার কথা খুব মনে পড়ছে। বজবজের মাটিতে সারা জীবনের রক্ত জল করে দিয়ে তাঁরা চটকল থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। খাঁদুদাকে কাজ করতে করতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। চটকলে মজুরির হার বদলানো তাঁরা দেখে যান নি। মজুরকে যে লড়াই তাঁরা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আজকের সুখসুবিধেগুলো তারই ফল।

বুড়ো আবেল সাহেব এখন নেই। বাংলা পড়ে ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে যাঁর ছিল প্রায় নিখুঁত জ্ঞান। তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম পড়া আর পাখি-পড়ার মধ্যেকার পার্থক্য।

সুধীনদা তো আমাদের চোখের সামনে বুড়িয়ে গেলেন। প্রায় বালক বয়সে স্বদেশিতে এসে ক্রমে সর্বহারার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দুর্মর আশার সঙ্গে তাল ফেলে চলতে এমন কি আমারও মাঝে মাঝে দম ফুরিয়ে যায়।

গ্রামের ডোবা পুকুরগুলো দেখতে দেখতে সুধীনদা বলেন, এখানে করতে হবে মাছের চাষ। ব্যাঙ্ক থেকে লোন যোগাড় করা যাবে না?

আমি বলি, সমবায় গড়লে হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

সত্যি, চেষ্টা করলে আরও অনেক কিছু হতে পারে। নারকোলের যে ছোবড়া এখান থেকে বাইরে চালান যায়, তা দিয়ে দড়ি-দড়া গদি আরও কত কী বানানো যায়। পাটের দড়ি দিয়ে বোনা আর পাটের কাপড়ে সেলাই-করা নানা রকমের দরকারী আর শৌখিন জিনিস। অনেকে বাঁশ দিয়ে ঝুড়িঝোড়া মাছ-ধরা পলো ঘুনী—এমনি নানা জিনিস তৈরি করে ব্যানার্জীর হাটে বেচে আসে। এসব জিনিস

আরেকটু শিখিয়ে পড়িয়ে আর আঁটঘাট বেঁধে করতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সুধীনদা বললেন, সেই আছিপুরে বিড়লাদের একটিমাত্র ডেয়ারি ছাড়া এদিকে আর কোনো ডেয়ারি নেই। একটু উদ্যোগ থাকলে শুধু ডেয়ারি কেন, হাসমুরগির চাষও হতে পারে।

'ডাকবাংলার ডায়রি'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল অনেক নাম সে সময়ে আমি ইচ্ছে করে বদ্‌লেছিলাম। তার নানাবিধ কারণ ছিল। কে কিভাবে নেবে বলা তো যায় না। নিজের অজান্তে আমিও হয়ত কাউকে মুশকিলে কিংবা কারো মনে আঘাত দিয়ে ফেলতে পারি। আমার লেখায় কেউ যদি বিশেষ কাউকে দেখতে চেয়ে খুঁজে না পান জানবেন বেনামে বা নামহীনভাবে তাঁরা আছেন।

বজবজ থেকে আমাকে একজন টেলিফোন করে জানিয়েছেন, বজবজের যে সর্বাধুনিক কারখানাটি হয়েছে সেখানে দুচারটি নিম্ন পদে ছাড়া সমস্ত কাজেই এরাজ্যের বরাবরের বাসিন্দাদেরই নেওয়া হয়েছে।

কথাটা শুনে ভাল লাগল।

বজবজে বাঙালীর কাজ পাওয়ার হারের কথা যাঁরা তুলেছিলেন তাঁরা কিন্তু ছোট মন নিয়ে কথাটা বলেন নি। স্থানীয় লোকদের বসিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে লোক এনে লাগানো—এটা আর যাই হোক ভালোমানুষি নয়। মজুরে মজুরে লড়িয়ে দেওয়ার মতলবটাই সেখানে প্রবল।

তাছাড়া এটাও তো দেখতে হবে যাতে দুনিয়ার লোকে আমাদের না বলতে পারে—আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

বজবজের অসুখ দেখে এসেছি। সব মাথা আর সব হাত মিলিয়ে তার ভাল হওয়ার খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমার উদ্বেগ যাবে না।

আগে ছিল বাহান্ন বাজার

বাসে পেল্লায় ভিড়। আমি নেমে যাব চন্দ্রকোণা রোডে।

ময়নাকাঠির পর বেশ খানিকটা শালের জঙ্গল। ছোট ছোট গাছ বড় হতে সময় লাগবে। জঙ্গলের ঠিক গায়ে আগে-পরে দুটো আদিবাসী গ্রাম। তারপরই তুলসীচটি আর কেয়াবনী।

বাসে আমার ঠিক পাশে বসেছিল নিত্যযাত্রী তিনজন ছাত্র। মেদিনীপুর কলেজে তারা পড়ে। বত্রিশ মাইল রাস্তা। যেতে কম্‌সে কম দু ঘণ্টা লাগবে। দিনের চার ঘণ্টা সময় যেতে আসতেই নষ্ট হয়। ট্রেন হলে দাঁড়িয়ে বা ব'সে বই পড়া যেত। কিন্তু বাসের ঝাঁকানিতে পড়া অসম্ভব। কলেজে ক্যান্টিন ছিল, এখন তাও বন্ধ। বিকেলে কলেজ ছুটি না হওয়া অবধি সারাদিন এক কাপ চাও জুটবে না। শুনে খুব মায়া হল।

আবার এও ঠিক, একটু দুঃখকষ্ট থাকলে জীবনে চাড় আসে। খুব বেশিও নয়, আবার একেবারে বেমালুমও নয়—। সব কিছুর জন্যেই একটু কষ্ট করা ভাল।

চন্দ্রকোণা রোডে নেমে আমি তো অবাক। এ অঞ্চলে আমি পা দিচ্ছি আজ চৌত্রিশ বছর পর। তখন কুঁড়েঘর ছাড়া কিছু দেখি নি। এখন যেদিকে তাকাই চারিদিকে শুধু পাকাবাড়ি চোখে পড়ে।

প্রথমবার এসেছিলাম কংগ্রেস নেতা কুমার জানার সঙ্গে। ওঁদের গাড়িতে। সে সময়টা ছিল বেআইনী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের

যুগ। আমার সঙ্গে ওঁদের ছিল রাজনীতিতে তুস্তর মতপার্থক্য। কিন্তু তাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব হয় নি। ওঁরা আসছিলেন মিটিং করতে। আমি খবর নিতে। ওঁর সেই নেচে নেচে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গির কথা এখনও আমার মনে আছে।

চন্দ্রকোণা টাউনের বাসে উঠে এইসব ভাবতে ভাবতে আসছিলাম।

ডাবচা পেরিয়ে বাঁদিকে চলে গেছে ডিগরির টি-বি হাসপাতালের রাস্তা। তারপর আঁধারনয়ন, ধরাবিলা, লালসায়ের আর গোপীশাহী হয়ে এসে পৌঁছুলাম চন্দ্রকোণা টাউনে।

প্রথম যেবার এসেছিলাম, তার চেয়ে চন্দ্রকোণা এবার বেশ কিছুটা জমজমাট বলে মনে হল। শুনলাম রাস্তা হয়ে আর যানবাহনের চলাচলের দরুন শহরে লোক বেড়েছে, কাজ কারবারও বেড়ে গেছে। আগে যেখানে কলকাতায় পৌঁছুতে পুরো দিন লেগে যেত, সেখানে সটান বাসে লাগে তিন ঘণ্টা।

এখানকার এম-এল-এ এখন সত্য ঘোষাল। এই চন্দ্রকোণাতেই ওকে আমি প্রথম দেখি। তখন ওর পনেরো-ষোল বছর বয়স। এখন ওর মেয়েই বি-এ পাশ করে বসে আছে। অতীতের চেয়ে বর্তমানের ওপর আমার টান বেশি হলেও চন্দ্রকোণায় এলে ইতিহাসকে এড়ানো যায় না।

আগের বার দেখা হয় নি বলে সত্য এবার নাকে দড়ি দিয়ে আমাকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। স্থাপত্য বুঝি না, কিন্তু মন্দিরগুলো সত্যিই দেখবার মত। পঞ্চরত্ন আর নবরত্নের মন্দির। কোনোটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাথরের জোড়বাংলা। কালাপাহাড়ের ভয়ে নাকি জলেডোবানো শিব। মন্দিরের গায়ে সারবাঁধা পোড়ামাটির মূর্তি। কোনো কোনো মন্দিরে ওড়িশার স্থাপত্য রীতির ছাপ। আছে বড়, মধ্যম আর ছোট—তিনটি অস্থল।

পশ্চিম ভারতীয় বৈষ্ণব মোহান্তদের আখড়া। আছে নানকপন্থীদের মঠ। লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠিত 'রাজার মা-র পুকুর'; 'রাজার মা-র কালী'।

এদিক সেদিকে ছড়ানো তিনটি ভাঙা দুর্গ। মুখে মুখে আজও বেঁচে আছে রাজাদের নাম। রাজা চন্দ্রকেতু। মাহিষ্যনেতা কালু ভুইঞা। চৌহান বংশের বীরভানু আর মিত্রসেন ভানু।

আজ থেকে একশো বছর আগে সব গিয়ে থুয়েও চন্দ্রকোণা শহরের কিছুটা জাঁকজমক ছিল। তার কিছু আগে চন্দ্রকোণা আর ঘাটাল তখন হুগলী জেলা বদল করে মেদিনীপুর জেলায় এসেছে। চন্দ্রকোণা তখন মেদিনীপুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। তখন লোকসংখ্যা ছিল একুশ হাজারের কিছু বেশি। তারপর কমতে কমতে বিশ শতকের মাঝামাঝি এই সংখ্যা প্রায় সিকিভাগে এসে ঠেকে।

১৬৭০ সালের ভ্যালেনটিনের যে ম্যাপ, তাতে চন্দ্রকোণাকে বড় গঞ্জ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানকার আখচাষ আর তাঁতশিল্পের তখনও খুব নাম। খুব ভাল সুতো হত। আঠারো শতকেও এ শহর ছিল জমজমাট। এখানকার ডোরিয়া কাপড়ের তখন চারিদিকে খুব চাহিদা। তারপর জোর করে এখানকার বাজার কেড়ে নিল বিলিতি মিলের কাপড়। তাঁতীদের আঙুল কাটা গেল।

সত্য বলল, এখন আর বাহান্ন বাজার নেই বটে—তবে ভাইয়ের বাজার, খিড়কি বাজার, বড় বাজার, নতুন বাজার, সমাধি বাজার আজও আছে। কলকাতায় এখনও চন্দ্রকোণার লোকের নাম শুনবেন —তবে ছাপাখানার লোক, রান্নার লোক, বইয়ের দোকানের লোক, পূজারী ব্রাহ্মণ এই হিসেবে।

একাত্তর বছর বয়সের রাধারমণ সিংহের কাছে বসে আবার সেই পুরনো কথাই শুনলাম :

'এখানকার মট্‌রী ঘি-র কথা তো জানেন, আমার বাবার আমলেও সেই মট্‌রী ঘি বাঁকে করে কলকাতায় চালান যেত। নদীতে উজান-ভাঁটার ব্যাপার ছিল। তাই চার-পাঁচ দিন লেগে যেত। তেলীঘর একশো বছর আগেও লোকে দেখেছে। শাঁখারীপাড়া ছিল—শাঁখা, আংটি হত। ছেলেবেলায় দেখেছি করাত দিয়ে শাঁখাগুলো কেটে চাকা চাকা করা হত, তারপর ফাইল দিয়ে ঘষত। অ্যাসিডের ব্যবহার তখন ছিল না। এখন হাজার খুঁজলেও একজন শাঁখারী পাবেন না। তাদের পড়ো ভিটেয় গেলে দেখবেন এখনও শাঁখের টুকরোগুলো পড়ে আছে শঙ্খ শিল্পকে মেরেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কাঁসা-পিতলের শিল্পেরও খুব নাম ছিল। পুরীতে এক রকমের বাঁকানো শিঙে বাজানো হয়। তার নাম ভেরী। সেই ভেরী এখানে তৈরি হত। সুতি কাপড় ছাড়াও এখানে তৈরি হত এক রকমের পাটের ক্ষৌম-বস্ত্র—তাকে বলা হত 'পাট্‌রা'। লোরিপাড়ায় তৈরি হত আলতা। এখনকার মত শিশির তরল আলতা নয়। আমার জীবনে শুধু একজন মেয়েকেই আমি তা তৈরি করতে দেখেছি। তুলো চ্যাপ্টা করে হাড়ির মধ্যে রেখে তাতে বিউলি কলাই বাটা দিয়ে লাক্ষা মেশাত। কুলগাছে এক রকমের লাক্ষাপোকা হয়, ছাল থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গ্রামের গরিব মেয়েরা সেগুলো বিক্রি করত। সেগুলো সেদ্ধ করে তার কষ থেকে এক রকমের টকটকে লাল রং হত। তাই দিয়ে তৈরি হত আলতার পাতা।

'ওড়িশার সঙ্গে আগে এসব অঞ্চলের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। চৈতন্য-দেবের পুরীতে যাওয়ার যাত্রাপথ এরই পাশ দিয়ে। এখানে এক গ্রাম আছে। তার নাম উড়িয়াশাহী। ময়ূরভঞ্জ থেকে এক রকমের কাঠ আসত। তা দিয়ে হত গোল গোল নিরেট চাকার গাড়ি।

'আগে এই পুরো অঞ্চলটাতেই ছিল নীলের চাষ। কারখানাগুলোর ভগ্নাবশেষ এখনও চারদিকে ছড়িয়ে আছে।'

নগর চন্দ্রকোণার পুরনো শিল্পসমৃদ্ধি ধ্বংস হওয়ার কারণ বর্ণনা

করে রাধারমণবাবু বললেন, 'ওদিকে হল রেলের লাইন আর এদিকে হল ঘাটাল মহকুমা। ফলে ব্যবসাগুলো সব সরে গিয়ে আলাদা আলাদা অনেক গঞ্জ হয়ে গেল। চন্দ্রকোণা আর ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র রইল না।'

এর সঙ্গে বোধহয় আরও দু-একটা কারণ যোগ করা উচিত। ইংরেজদের স্বার্থে এদেশের তাঁতীদের পথে বসানো হল। ম্যালেরিয়ায় মাছির মত লোক মরল। প্রচণ্ড খরায় মাঠঘাট শুকিয়ে গেল। এলাকার লোকে পয়সার জন্যে কেবল আখ, পাট, আলু, কলা আর ফলের চাষ করত বলে দুর্ভিক্ষের সময় চালের অভাবে মারা পড়ল।

স্বাধীনতার পর শুধু রাস্তাটুকু হয়েই চন্দ্রকোণার হাল খানিকটা ফিরেছে। একটা করাতকল হয়েছে। কাজ-কারবারের কিছুটা সুবিধের দরুন শহরে লোকও বেড়েছে। সাইকেল-রিক্সা চালিয়ে বেশ কিছু লোক এখন সংসার চালাচ্ছে। শহরে এখন সিনেমা হয়েছে। গ্রামের মেয়ে-পুরুষেরা ভিড় করে দেখে যাচ্ছে বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবি। রাতের শো ভাঙলে তবে শেষ বাস ছাড়ে।

বড় অস্থলের মোহান্ত রামদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হল না। বোর্ডে তাঁর নামের পাশে ইন্ বুঁজিয়ে আউট লেখা। মন্দিরটি বেশ লক্ষ্মীমন্ত। এ শহরের তিনি প্রাক্তন পৌরপতি। দেখা হলে এখানকার হালচাল হয়ত কিছুটা জানা যেত।

সত্য ঘোষালকে সঙ্গে নিয়ে আশপাশের গ্রামাঞ্চলের খানিকটা খবর নিলাম। এক নম্বর ব্লকে পড়ে চল্লিশটা মৌজা। লোকসংখ্যা প্রায় ষাট হাজার। তার ভেতর হাজার পাঁচেক ভূমিহীনের মধ্যে বিলি হয়েছে পৌণে চার হাজার একরের কিছু বেশি চাষের জমি। প্রায় চারশো জন পেয়েছে বাস্তুজমি। সবাই চায় ভাল জমি। নিরেস জমিগুলো কেউ নিতে চায় না। ফলে জমি

বিলি করতে গিয়ে হয় মুশকিলের একশেষ। তাছাড়া জমি-জায়গা নিয়ে কোর্টকাছারি তো লেগেই আছে।

দেখেশুনে মনে হল, ওপরওয়ালারা হুকুম করেই খালাস। সাক্ষাৎ যোগাযোগের বদলে কাজ হয় আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে। ফলে ওপরনিচে বোঝাপড়ার অভাব হয়। কাজগুলো হয় যান্ত্রিকভাবে, তাতে প্রাণের টান থাকে না। কাজের লোকের কিংবা সময়ের হিসেব না করে এলোপাথাড়ি কাজের বোঝা চাপানো হয়। তার ফলে চাকরি বাঁচাবার জন্যে দায়সারা গোছের কাজ হয়। জমি বাঁটোয়ারার কাজ ঠিকভাবে করতে গেলে আরও আমিন এবং আরও কর্মচারীর দরকার। তাছাড়া ভাগচাষী প্রমাণ করতে গিয়ে জান যাওয়ারও উপক্রম হয়।

সরকারী আপিসঘরে দেখলাম অন্ধকার হয়ে আসা ঘরের দেয়ালে ইলেকট্রিকের সুইচ, কিন্তু মাথার ওপর সিলিঙে সেকেলে টানা পাখা ঝোলানো। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার?

আপিসের কর্তা বললেন, এই দেখুন এক মুশকিল। ইলেকট্রিক নিলেই তো পাঙ্খাওয়ালা বেচারার চাকরি খতম! ওকে বেয়ারার পোস্টে নেওয়ার জন্যে ওপরে লিখেছি। অর্ডার এসে গেলেই টানা পাখা সরিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক চালু হবে। সরকারী আপিসের নিয়ম-কানুন তো জানেন। তার ওপর চোদ্দ মাসে বছর।

ফেরবার সময় ভেতরে আলো জ্বলছে দেখে এক পাঠাগারে ঢুকলাম। চৌত্রিশ বছর আগে চন্দ্রকোণার এক জীর্ণ ঘরের পাঠাগারে ঢুকেই সত্য ঘোষালের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। মনে আছে তার পাশেই ছিল মাঠ। সেখানে ফুটবল খেলেছিলাম। স্বাধীনতার পর দেশ কত বদলেছে সাজানো-গোছানো লাইব্রেরিটা দেখে তা বোঝা গেল। এখন সরকার থেকেই লাইব্রেরিয়ানকে মাইনে দেওয়া হয়। জেলা লাইব্রেরি থেকে ধার হিসেবে নতুন নতুন বই আসে পাঠকদের পড়ানোর জন্যে।

কী বই? শুনে তরুণ লাইব্রেরিয়ানরা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, যেসব বইয়ের নাম শুনলে আপনারা নাকমুখ কোঁচকান সেই সব হালকা বই। লোকে গোগ্রাসে গেলে। কবিতার বই? লোকে ছুঁয়েও দেখে না।

আমি ঘাবড়াই না। আগে বই পড়ার অভ্যেস তো হোক। হালকা থেকে শুরু করে হয়ত আস্তে আস্তে ভার বইবার ক্ষমতা বাড়বে।

বাসে করে কলকাতায় ফেরবার পথে হাতে খবরের কাগজ নিয়ে এক অপরিচিত ছোকরা আমাকে একটু ঠেস দিয়েই বলল, 'শেষ-কালে এই কাগজটায় লিখছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ লিখছি, আপনি পড়ছেন বলে।'

আগে ছিল জঙ্গলমহাল

এবার আর খড়্গপুর থেকে বাসে নয়। পুরোটাই ট্রেনে।

যেতে যেতে ঠাহর হল গড়বেতা স্টেশন থেকে গড়বেতা টাউন কম দূর নয়। এসব জায়গায় মাটির রং-ঢং অন্য। রং কোথাও ফিকে গেরুয়া, কোথাও লালচে। মেদিনীপুর শহরে (ইংরিজি বানানে এখনও কিন্তু 'মিড্‌নাপুর') দাঁড়ালে মাটির রুক্ষ আর সজল দুটো রূপই চোখে পড়বে।

রাস্তার দিকে তাকালেই দেখা যায়, ঝুরঝুর করছে বালি। চারপাশে খটখট করছে লালমাটির ডাঙা। ডানদিকে বড় বড় হিমঘর। সমস্তই নতুন হয়েছে।

যেতে যেতে দূর থেকে তেরচা হয়ে কাছে এগিয়ে আসে কাজু-বাদামের সরকারী বাগান। ইস্কুলকলেজ আপিসকাছারি পেরিয়ে শিলাবতী নদীকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকে গড়বেতা শহরের দোকান-পাট আর লোকালয়। শহরের বুকের ওপর দিয়ে গেছে বাস-রাস্তা। আদালতে মামলা ঝুলছে বলে একটি বাদে আর সব বাড়ি ভেঙেচুরে রাস্তা চওড়া হচ্ছে। এ রাস্তা সিধে চলে গেছে বিষ্ণুপুর।

সরোজ রায়ের বাড়িতে দেখলাম আজও ইলেকট্রিক আসে নি। সে অভাব পুষিয়ে দিল দ্বাদশীর চাঁদ। খিড়কির দিকে মাঠ পুকুর গাছগাছালি ঝলমল করছিল জ্যোৎস্নায়।

উঠোনে এ-গাছ সে-গাছের মধ্যে এক গন্ধহীন চন্দনের গাছ।

মাঝখানে বাঁধানো কুয়ো। এখানে জল আর হাওয়া দুই-ই ভাল। স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে গড়বেতার নাম আছে।

সরোজবাবুর বাবার ছিল পাখির শখ। নানা জায়গা থেকে দামী দামী পাখি আনাতেন। এক নিরুদ্দেশ ভাইয়ের খোঁজে দীর্ঘদিন ভবঘুরে হয়ে এদেশ ওদেশ করে শেষে বনবিভাগে কাজ নিয়েছিলেন। কলকাতার তিনটে বাড়ি, স্থাবর অস্থাবর অনেক সম্পত্তি—পৈতৃক এক কানাকড়িও তিনি ছোঁন নি। দীর্ঘায়ু হয়ে গড়বেতায় তাঁদের এই মাটির বাড়িতেই তিনি চোখ বুঁজেছেন।

ইস্কুলে পড়তে পড়তেই স্বদেশীর অগ্নিমন্ত্রে সরোজবাবুর দীক্ষা। তারপর আন্দামানে সাজা খেটে এসে জেলখালাসের পর আজ অবধি চাষী আর ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। হাত দিয়ে সাপ ধরা এক সময়ে ছিল তাঁর বাতিক। একবার ধরতে গিয়ে বেকায়দায় গোখরোর ছোবল খেয়েছিলেন। বরাতজোর বেঁচে গিয়েছিলেন। শুধু সাপ নয়, পুলিশের গুলির হাত থেকেও বার কয়েক।

মাটিতে বালির ভাগ বেশি বলেই বোধহয় গড়বেতায় এত ঠাণ্ডা।

আগে এসব দিকে ছিল জঙ্গল। ইংরেজরা এ অঞ্চলকে বলত জঙ্গলমহাল। আস্তে আস্তে নদী, খাল, নিচু জায়গার ধার দিয়ে দিয়ে চাষবাস আশ্রয় করে গড়ে ওঠে লোকের বসতি।

এর মধ্যে একটি সম্প্রদায় বেছে নিল ডাঙা জমি। সেখানে গড়ে উঠল বিরাট বিরাট লোকালয়। সরোজবাবুর কাছে এটা বরাবরের একটা রহস্য ছিল। এত জায়গা থাকতে ওরা কেন ডাঙা জমিতে এসে বসে গেল? চাষবাস করতে গেলে বৃষ্টির জলই সেখানে একমাত্র ভরসা।

সন্ধিপুরের ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঐ অঞ্চলের একটি ছেলে তাঁকে বলেছিল—জানেন, লোকে আমাদের বলে তুঁতে মুসলমান

জিগ্যেস করায় ওর নানী ওকে বলেছিল—তোর নানার নানা এখানে এসেছিল তুঁত চাষ করতে। তারপর সায়েবদের আমলে সিল্কের ব্যাবসা উঠে যাওয়ায় তুঁত চাষও বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা তুঁত চাষ ছেড়ে ধানচাষ ধরল। কিন্তু জল কোথায়? ফলে বেশির ভাগ তুঁতচাষীই হয়ে গেল গরিব ক্ষেতমজুর।

সরোজবাবু মনে করেন, গ্রামের এই গরিবদের হাল ফেরানো খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। নলকূপ খুঁড়ে সেচের জল যোগানো যায়। সেখানে তুঁত চাষ তো বটেই, সেই সঙ্গে তুঁত গাছের মধ্যে মধ্যে ফলানো যায় টমেটো আর লঙ্কা। মুর্শিদাবাদে তিনি নিজে তুঁত-চাষীদের এইভাবে চাষ করতে দেখে এসেছেন। তাদের সংসার খরচ চলে যাচ্ছে টমেটো আর লঙ্কার রোজগারে। তার ওপর যোগ হচ্ছে তুঁতচাষের আয়।

এটা হলে ক্ষেতমজুররা সম্বৎসরের কাজ পেয়ে যাবে। এক তুঁতচাষেরই তো রকমারি কাজ। গাছের বিস্তর পরিচর্যা দরকার। ডাল ছাঁটা, পাতা তোলা, গুটিপোকাকে খাওয়ানো, পাতার নানা ধরন তৈরি করে পোকাগুলোকে বড় করা। এমন অনেক কাজ। এইভাবে গোটা ডাঙা অঞ্চলটার চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া যায়। পরাধীনতায় মানুষ যা হারিয়েছিল, স্বাধীনতা এমনি করে তার দ্বিগুণ সুখসমৃদ্ধি ফিরিয়ে দিতে পারে।

স্বাধীনতার পর এসব অঞ্চলে জীবনের ধারা আমূল বদলেছে। জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ায় চাষীদের একটা অংশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সেচের জল, ধানের ফলন-বর্ধক বীজ, রাসায়নিক সার আর পোকামারা ওষুধ—এই চতুর্বিধ উপায়ে বছরভর মাঠগুলো সবুজ হয়ে থাকছে। জনমজুররা কাজ পাচ্ছে আগের চেয়ে বেশি।

আগেকার দিনে তো চাষ বলতে ছিল মোটে দু রকমের ধান—আউশ ঝাঁঝি আর আমন। এখন ধানের রকমারি বীজ। মাস

তারিখেরও বাধাবাঁধি নেই। তাছাড়া ফলাওভাবে হচ্ছে আলুর চাষ তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন হিমঘর।

রেলের চেয়ে আজকাল বাস-লরির গুরুত্ব যে বেশি, গড়বেতায় এসেও সেটা স্পষ্ট ঠাহর হল। দোকানপাট বাজারহাট সমস্তই বাস-রাস্তার ধারে। তার পাশে স্টেশনপাড়া যেন টিম টিম করছে। এখন তো কলকাতা অবধি দিব্যি বাসে চলে যাওয়া যায়।

গড়বেতা এককালে ছিল বাগড়ি রাজাদের রাজধানী। পুরনো দুর্গের ধ্বংসস্তূপ দেখে আঁচ করা যায় এ জায়গায় নামের আগে কেন গড় রয়েছে। পুরনো তোরণগুলোর নাম—লাল দরওয়াজা, হনুমান দরওয়াজা, পেশা দরওয়াজা। পুরনো দীঘিগুলোর মধ্যিখানে একটি করে মন্দির। জলটুঙ্গি, পাণ্ডুরিহাড়ুয়া, ইন্দ্রপুষ্করিণী, মঙ্গলা—দীঘিগুলোর এমনি সব নাম। আজ থেকে কম করে সোয়া চারশো বছর আগে এই দীঘিগুলো খোঁড়া শুরু হয়েছিল।

এমন একটা সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা ইংরেজ আমলে কিভাবে যে হতশ্রী হয়ে পড়ল, সেটাও আন্দাজ করা অসম্ভব নয়। এসব ছিল ইংরেজ আমলে আদিবাসী মানুষদের সশস্ত্র বিদ্রোহের জায়গা। ফলে, তারা কখনই শাসকদের নেকনজর পায় নি।

সকালে উঠে কনকনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলাম কেশিয়ায়।

বাস থেকে নেমে খানিকটা হাঁটতে হয়। রাস্তার পাশেই চাষের ক্ষেত। সর্ষে আর কপির ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্যে কুয়ো কেটে কপিকলে জলসেচের ব্যবস্থা।

একটু এগিয়ে বাঁদিকে ইঁট দিয়ে তৈরি একটা ইস্কুলবাড়ি। তপশীলী আর আদিবাসী গ্রামবাসীরা নিজেরা এক টাকা দু টাকা চাঁদা দিয়ে এই হাই-ইস্কুলের পত্তন করেছে। রাস্তায় একজন

ট্রাউজার-পরা আদিবাসী যুবকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি এই ইস্কুলেরই মাস্টার। ইস্কুল সম্পর্কে উৎসাহ আর গর্ব তাঁর চোখেমুখে।

মাঝের গ্রাম হয়ে যাব উপর গ্রামে।

গ্রামে ঢোকার মুখে এক জায়গায় মাটি দিয়ে লেপা ইঁদ-পূজোর মণ্ডপ। তার চারপাশে কোথাও বাঁকুড়ার ঘোড়া, কোথাও গ্রাম্য দেবীদের মূর্তি।

যাঁর রেশনের দোকান তাঁর অবস্থা বেশ ভাল বলেই মনে হল। গোলার সামনে স্তূপাকার খড়। মেয়েরা ধান ঝাড়াই করছে। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থাটা ওখানেই পাকা করে নেওয়া গেল।

রেশনে এখানে গমের বরাদ্দ সপ্তাহে মাথাপিছু দু কেজি। রোজ একবেলা রুটি খেলে একজনের সপ্তাহে চারদিনের খোরাক হয়। চিনি মেলে মাথাপিছু মাসে একশো তিরিশ গ্রাম। তাতে মাসে চার পাঁচ দিনের বেশি চলে না। গমের কেজি এক টাকা চল্লিশ আর ভাঙাতে আরও দশ পয়সা। খোলা বাজারে আদার দাম দু টাকা। চিনির কেজি দু টাকা পনেরো। বাজারে তার দাম এখন চার টাকা পঁচাত্তর। উঠেছিল পাঁচ টাকা তিরিশে।

বাজারে যখন ধান ওঠে, লোকে আর গম কেনে না। ভাল ধান হওয়ায় গত দু বছর রেশন-শপে চাল দেয় নি। গত বছর বাজারে চালের দাম উঠেছিল আড়াই টাকায়। এবার তো এখনই পৌণে দু টাকা। এবার খরায় ধান বা গম কোনোটাই ভাল হয় নি। তাই ভয় হচ্ছে, চালের দাম এবার বাড়বে।

বাজারে এখন চালের দাম এক টাকা পঁচাত্তর। সেক্ষেত্রে আলুর দাম শুধু পঁচাত্তর। তার মানে, ভাতের বদলে আলু খেলে অনেকটা সাশ্রয় হয়। তার জন্যে চাই অভ্যেসের বদল। এখন তো অনেক ভেতো বাঙালীরই রাত্রে রুটি না হলে চলে না। এক সময়ে খাওয়ার অভ্যেস

বদলাবার কথা বলে প্রফুল্ল সেন কম নাজেহাল হন নি। বোধহয় সেইজন্যেই ডাইনে বাঁয় এখন আর কারো মুখে এ বিষয়ে কোনো রা শোনা যায় না।

রেশন দোকানে বসে চা খেতে খেতে এই অঞ্চলের খবরাখবর নিচ্ছিলাম। এ তল্লাটের বেশির ভাগই জনমজুর। সকালে মুড়ি, দুপুরে ভাত—এই নিয়ে তাদের রোজ তিন টাকা। মেয়েরা পায় মুড়ি আর আড়াই টাকা। ছোটরা মাহিন্দার থেকে পায় সারা বছর খোরাকী, চারখানা কাপড়, দুখানা গামছা আর আড়াই থেকে চারশো টাকা কিংবা তার বদলে ধান।

জনমজুররা এখন বছরে গড়ে সাত মাস কাজ পাচ্ছে। চাষের কাজ আগের চেয়ে পরিমাণে বেড়েছে। তাদের এখনও কোনো জোরদার সমিতি গড়ে ওঠে নি।

জমিহীনদের শতকরা পনেরো জন কোনো জমি পায় নি। যারা পেয়েছে তারাও সবাই এখনও দূরের জমি দখল নিতে পারে নি। গায়ের জোরে অন্যরা সেখানে চাষ করছে। বাকি শতকরা পঁচাশি জনের যে অল্পবিস্তর জমি আছে, সেখানে শতকরা মাত্র পনেরো জন আছে যারা চার থেকে দশ একরের মালিক। সিলিং ফাঁকি দেওয়ার সংখ্যা শতকরা দু একজনের বেশি হবে না। খাস জমি পেয়েও বেহাত হয়ে গেছে এমন বোধহয় কেউই নেই।

আমার এই লোকশ্রুতিনির্ভর সংখ্যাতত্ত্বের ওপর খুব বেশি আস্থা না রেখেও মোটের ওপর এ থেকে একটা স্থানীয় ছবি পাওয়া যাবে।

কুলচিডাঙায় যেতে হল রেললাইনের পাশ বরাবর পায়ে-চলা রাস্তায়।

আমাদের সঙ্গে চলেছিল গামি। কলকাতায় ইংরিজি-ইস্কুলে পড়া ছাত্র। জীবনে এই প্রথম সে গ্রাম দেখছে।

ওর দিদিমার সঙ্গে আমার প্রা পঁয়ত্রিশ বছরের চেনা

মেদিনীপুর শহরে। আটটি সন্তানের মা হয়েও সংসারের শেকল ছিঁড়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। কোলের মেয়ের হাত ধরে। অগ্নিযুগে বোমাপিস্তল রাখতে গিয়ে আর ফেরারীদের আশ্রয় দিতে গিয়ে অনেক দুঃখ তাঁকে সইতে হয়েছে। স্বামী ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। স্ত্রীকে তিনি হারিয়েছিলেন চাকরি হারাবার ভয়ে। ভদ্রলোক ছিলেন গ্রামের রক্ষণশীল পরিবারের লোক। ইংরেজকে আর তার পুলিশকে যমের মতন ভয় করতেন। ফলে স্বামীস্ত্রীতে বনিবনা হয় নি। পার্টিতে আমরা সবাই তাঁকে দিদি বলতাম। গড়-বেতায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল দু যুগ পরে। কিন্তু চেহারার খুব একটা বদল হয় নি।

গামির সঙ্গে আমিও রেললাইনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রংবেরঙের পাথর কুড়োচ্ছিলাম। হঠাৎ ওর মার কথা মনে পড়ল। দীপাকে যখন প্রথম দেখেছি তখন তার বয়স বোধহয় দু তিন বছরের বেশি হবে না। মনে হল, বছরগুলো হু হু করে কেটে যাচ্ছে।

কুলচিডাঙায় পৌঁছুতে মাঝরাস্তায় এই শুকনোর দিনেও বেশ খানিকটা জল ভাঙতে হল।

এই গ্রামে ছত্রিশ ঘর সাঁওতালের বাস। সমস্ত বাড়িরই উঠোন-দেয়াল সুন্দরভাবে নিকোনো। কেউ টুডু, কেউ সরেঙ, কেউ মুর্মু।

উঠতেই যে বাড়ি সেটা শিবনারায়ণ টুডুর। রেললাইনে একটু আগে ওকে দেখেছিলাম হাতুড়ি দিয়ে স্লিপারগুলো ঠুক ঠুক করতে। বলল, ও হল রেলের গ্যাংম্যান।

বয়স জিগ্যেস করায় ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। প্রথমে বলল, তা পঁচাত্তর হবে। চোখ কপালে তুলতে দেখে তাড়াতাড়ি কমিয়ে দিয়ে বলল পঁয়তাল্লিশ। তারপর বেশি কম হয়ে যাচ্ছে ভেবে বলল পঞ্চাশ।

শিবনারায়ণের তিন ছেলে। ছোটটির নাম মিলন। অষ্টম

শ্রেণীতে পড়ে। বড় দুজনও এইট নাইন অবধি পড়েছে। শিব-নারায়ণ নিজে বাংলা, সাঁওতালি জানে।

এক চক্কর ঘুরে দেখে এলাম গ্রামটা। ঘরবাড়ির অবস্থা দেখে খুব একটা খারাপ বলে মনে হল না। কারো উঠোনে ধান শুকোচ্ছে, কারো উঠোনে কলাই।

মোহন্ত মুর্মুদের বাড়ি বেশ বড়। খাঁকির উর্দি-পরা একটা লোক বেরিয়ে চলে গেল। হয়ত এই বাড়িরই কেউ হবে। একটু বাজিয়ে দেখে নিল আমরা সরকারের লোক কিনা। বাড়িতে ভাইরা আর তাদের ছেলে-বউ বাপ-মা নিয়ে তেরো-চোদ্দজন লোক। নিজেদের জমি দশ-এগারো বিঘে, আরও সাত বিঘে ভাগে করে। মোহন্ত ফোর-ফাইভ অবধি পড়েছে।

এ গাঁয়ে কোনো প্রাইমারি ইস্কুল নেই। বর্ষার রাস্তায় এক কোমর জল হয় বলে পাশের গাঁয়েও পড়তে যেতে পারে না।

এখানেও দেখলাম সরকারের মুখ চেয়ে বসে থাকা। নইলে শিবনারায়ণের তিন ছেলে রয়েছে. তারাও তো গাঁয়ে বসে বাচ্চাদের পড়াতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে চাড় নেই।

শিবনারায়ণের বউ বলল খেয়ে যেতে হবে। রফা হল মুড়ি আর হাঁড়িয়ার।

বসে বসে ওদের তীরধনুকে আমরা হাতের টিপ পরীক্ষা করলাম। বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলা দেখালেন সরোজবাবু। দেখলাম লক্ষ্যভেদে একেবারে অব্যর্থ।

রাত্তিরে যখন গড়বেতায় ফিরলাম মাঠঘাট ঘরদুয়োর ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার জোয়ারে।

অনেক রাত অবধি ঠাণ্ডার ভয়ে ঘর বন্ধ করে ছোট সরোজের কাছে শুনলাম এখানকার জেলখানার গল্প। দু বছরের ওপর জেলে থেকে হালে সে জামিনে বেরিয়েছে। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল জেলের হালচালও এখন কত বদলে গেছে। সেসব গল্প একজন

মারাঠী জেলওয়ার্ডারের মুখেও শুনলাম। সে ছিল মিলিটারিতে। বাংলার এক সীমান্ত শহরে থাকার সময় প্রেমে পড়ে এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে। তারপর নেয় জেলের চাকরি।

ওর এখন ঝোঁক হয়েছে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কবিতা তর্জমা করবে। একেই বলে বাংলার জল।

কিন্তু বেচারা বাঙালী বউ!

উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা

ট্রেনে বেশ বড় দল করে যাচ্ছিলাম। খুব ভোরে ট্রেন ধরতে হবে বলে রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোতে পারি নি। ভেবেছিলাম ট্রেনে উঠে চোখটা একটু মটকে নেব।

কিন্তু সকালের কাগজের মত শত্তুর আর হয় না। রেডিও হয়েও রেহাই নেই। সকালবেলায় খবরের মালাটা একটু জপে নিতে না পারলে শহরের লোকের মুখে চা রুচবে না।

কাগজে চোখ পড়তেই ঘুম ছুটে গেল। বড় বড় হরফের খবরটা সাদা বাংলা করলে দাঁড়ায়—রাণীগঞ্জ ছেড়ে পালান, শহর যেকোনো সময় ধ্বসে পড়বে। অমুক অমুক জায়গায় মাটি বসে গেছে, অমুক অমুক জায়গায় নিচে আগুন জ্বলছে।

আর আমরা এতজন মানুষ কিনা সেই রাণীগঞ্জেই সভা করতে যাচ্ছি।

পরক্ষণেই মনে হল ধ্বসে পড়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক হবে না। কেননা তাহলে রেল কোম্পানি কি এত লোককে ঢালাওভাবে রাণীগঞ্জে যাওয়ার টিকিট দিত? আমাদের সদাশয় সরকারও কি এ বিষয়ে নির্বিকার থাকত? তাছাড়া শহরের লোকই বা কোন আক্কেলে নিজেরা না পালিয়ে পাঁচ ভাষার লোককে সভা করতে ডাকে।

এইসব যুক্তিতে ভয়ের ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে বেশি সময় লাগল না।

গাড়ির নাম কালো-হীরে এক্সপ্রেস। কয়লাই সেই কালো মানিক। গোটা কয়লা অঞ্চল বেড় দিয়ে ট্রেন যাবে রাণীগঞ্জ হয়ে ঝরিয়া।

কলকাতা থেকে দুর্গাপুরে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, এ ট্রেনে তেমন লোকও বেশ-কিছু। তবে ভিড় বাড়ে বর্ধমান থেকে। দুর্গাপুরের পর বিস্তর জায়গা মিলবে বসবার।

যাত্রীদের গালগল্প শুনতে শুনতে জানলার বাইরে চোখ খুলে তাকাবার কথাও অনেক সময় মনে থাকে না। ক্যানেলের জল পেয়ে এখন তো বলতে নেই বাইরেটা বারোমাসই সবুজ। খনার বচন খাটছে না। ধান রোয়া-বোনার দিনক্ষণ বলে আর কিছু নেই। মাঠে এখন কাজের লোকের ফুরসত খুব কম।

থেকে থেকে যাচ্ছে আসছে রকমারি হকার। কালি ভরার ঝামেলা ঘুচিয়ে কলমকে হার মানাচ্ছে এখন ডটপেন। কালীপদ দে-র আশ্চর্য মলম আর ঢোল কোম্পানির দক্রহুতাশন—এসব নাম শোনা যায় না। ক্ষুদে ক্ষুদে তানসেনের বদলে এখন পাওয়া যাবে লেবুর লজেঞ্চুস। শীত গ্রীষ্মে হবে সওদার তফাত। আজ যে কমলালেবু বেচছে, সে বেচবে বোতলের মিষ্টি জল। চাহিদার সঙ্গে তাল ফেলে চলবে যোগান। গাঁ-শহরের লোক বুঝে লাইনবিশেষে জিনিসের রকমফের, হকারদের বোলচালেরও তফাত।

রেলের কামরায় এখনও কিন্তু কয়েকটা জিনিস বেচতে দেখি না। যেমন: গাছের সার আর চারা-বীজ, দাঁত খোঁটার খড়কে, খাতা-বইতে নাম ছাপাবার মিনি প্রেস, শেকড়বাকড়, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, পেরেক ইস্কুরুপ, নাটবল্টু, সাইকেলের ছোটখাটো পার্টস, সর্দি লাগার মরশুমে শস্তার রুমাল, জলবৃষ্টির সময় শস্তার টুপি বর্ষাতি বা গালোশ, মোট বইবার সুবিধের জন্যে হ্যাণ্ডেলওয়ালা বেল্ট আর সর্বার্থসাধক নানা মাপের চাকা, হাতে হাজা না ধরে বা

চোট না লাগে এই রকমের শস্তার দস্তানা। এমনি আরও অনেক কিছু।

হঠাৎ আমাদের কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে একটা দোতারা বেজে উঠল। বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে। অসাধারণ মিষ্টি হাত। উর্দুভাষী শামসুজ্জামান সঙ্গীতের সমঝদার। শুনে বলল খুব পাকা হাত। ছেলেটির মাথা হেলিয়ে বাজানো আর গাওয়ার মধ্যে বেশ একটা উদাস ভাব আছে। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে কপালে এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল। পরনে তার পাজামার ছাঁটে বানানো লালচে ছিটের লম্বা প্যান্ট। জামাটাও বেশ ছিমছাম। পয়সার জন্যে গান গাইলেও ভিখিরি বলে মনে হয় না! অন্ততপক্ষে জাতভিখিরি নয়।

ছেলেটা যতক্ষণ গান গাইল, গোটা কামরা একেবারে চুপ। তারপরই আবার শুরু আপিসের গজালি আর ক্রিকেটের ময়নাতদন্ত।

প্রায় সওয়া শো বছর আগে এ লাইনের শেষ ইস্টিশান ছিল রাণীগঞ্জ। সঞ্জীবচন্দ্রকে পালামৌ যেতে হয়েছিল এখানে নেমে তারপর গরুর গাড়িতে।

আজ থেকে এক শো বছর আগে রাণীগঞ্জ ছিল গণ্ডগ্রাম। তারও এক শো বছর আগে এখানকার বুকের ওপর ছিল শুধু কাঁটাঝোপ আর গাছগাছালির জঙ্গল। খাঁটসুলিতে থাকত আটঘর গরিব গোয়ালা আর মুসলমান। সেখানে গোরা পল্টনেরা একবার ছাউনি ফেলেছিল বলে তার নাম বদলে গোরাবাজার হয়ে গেছে। জায়গার নামের মধ্যে যে কত ইতিহাস লুকনো থাকে!

এ অঞ্চলে সম্ভবত প্রথম কয়লা খুঁজে পান ছোটনাগপুর আর পালামৌয়ের কালেক্টার মিঃ সুয়েটোনিয়াস গ্রাণ্ট হিটলি। তখন ১৭৭৪ সাল। কিন্তু হলে হবে কি, এদেশের সম্পদ গড়ে তোলা

কিংবা বহির্বাণিজ্য বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। ফলে, কয়লা বার হওয়ার পরেও কয়লা তোলার কাজ আদৌ এগোয় নি। ওপর থেকে চেঁছে কয়লা তোলার ফলে ওরা ভেবেছিল বিলিতি কয়লার তুলনায় এদেশী কয়লা একেবারেই নিরেস। তাদের এই ভুল ভাঙতে বেশ সময় লেগেছিল। স্বাধীনতার এত বছর পরে আজও এমনি আরও কত ভুল ভুত হয়ে আজও আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে।

১৮৩৫ সালে আলেকজাণ্ডার কোম্পানি ব্যাবসায় ফেল মারলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাদের রাণীগঞ্জ খনির জমিজায়গা ঘরবাড়ি সব কিনে নিলেন। কার, ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানি কিছুদিন চলবার পর অন্য এক সাহেব কোম্পানির সঙ্গে মিশে গিয়ে তৈরি হল বেঙ্গল কোল কোম্পানি। আদতে কয়লার ব্যাবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল কলকাতায় চটকল আর সেইসঙ্গে আরও ছুট্‌কো-ছাটকা নানা কলকারখানা হওয়ার পর।

এগারায় ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানির দপ্তর। দামোদরের ধার থেকে পাঁচ শো হাত ভেতরে নারায়ণপুরীতে ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের তৈরি করা দেখবার মতন এক বাংলো। পরে সেটা হাত বদল হয়ে তার মালিক হন পি কে ঘোষ। তিনি মারা যাওয়ার পর এখন তার ভগ্নদশা। আসবাবপত্র তো গেছেই, •জানলা-দরজাগুলোও চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। পুরনো গেজেটিয়ারে দেখা যায়, ১৯০২ সালে খনির মুখ থেকে লোকে কয়লা কিনে নিয়ে যেত প্রতি টন দু টাকা বারো আনায়। আট ঘণ্টা কাজ করে একজন খনিমজুর কাটতে পারত দিনে আড়াই টন। কয়লা কাটার রোজ ছিল আট আনা থেকে বারো আনা। অদক্ষ মজুররা খনির ওপর কাজ করে রোজ পেত চার-পাঁচ আনা। মেয়েরা পেত এক আনা কি দু আনা। খুব কম খনিতেই সে আমলে সেফটি ল্যাম্প থাকত। ১৯০৮ সালে খনির নিচে দুর্ঘটনায় মৃতের হার ছিল হাজারে প্রায় দেড় জন।

রাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি হয় ১৮৭৬ সালে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় রাণীগঞ্জের লোকসংখ্যা ছিল হাজার পনেরো-ষোল। বার্ন কোম্পানির ছিল পটারি আর বামার-লরির কাগজ কল। এই দুই কারখানা মিলিয়ে মজুর ছিল দু হাজার। এছাড়া ছিল তিনটি তেলকল।

মহকুমার সদর ছিল গোড়ায় রাণীগঞ্জ। ১৯০৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি আসানসোল চলে যায়।

কয়লাখনি, কলকারখানা, পরিবহণ আর ব্যাবসা-বাণিজ্য—এই নানা সূত্রে ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষ এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। রাণীগঞ্জে বরাবরই চাল আর কয়লার বড় আড়ত। পুরনো যা ছিল, তার ওপর কলকারখানা বেশি বাড়ে নি। নতুনের মধ্যে আছে রোলিং মিল, ফাউন্ড্রি, ময়দাকল আর সেই সঙ্গে ছাপাখানা আর বিড়ি।

পাঁচ ভাষার লোক আমরা এসে উঠেছি শ্রীসীতারামজীউর ধর্মশালায়। ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে। মেঝের ওপর ঢালাও ফরাস পাতা। ঘড়ি ঘড়ি চা-পান। খাবার দাবার। সব কিছুরই সুন্দর ব্যবস্থা। রাত্তিরে আলো নিবে যাওয়ায় কবিসম্মেলন খতম ভেবে আমি টেনে ঘুম দিয়েছি। সকালে উঠে নবনীতার কাছে শুনলাম পরে আলো জ্বলেছিল, কবিসম্মেলনও হয়েছিল। সেইসঙ্গে বলল ওর খুব দুঃখ জীবনে কয়লাখনি দেখে নি।

বলাকওয়া করতে তার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

রাণীগঞ্জ থেকে গাড়ি ছুটিয়ে যে কয়লাখনিটা পাওয়া গেল, তার ম্যানেজার একজন কমবয়সী মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। নবনীতা কখনও খাদে নামা দূরের কথা, খনিও দেখে নি শুনে এবং আজকেই তাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে শুনে তিনি তখনই আমাদের খনিতে নামার সুযোগ করে দিলেন।

এমন যে ঘটবে আমরা তা ভাবতেই পারি নি। খনিতে আমি শেষবার নেমেছি, তাও তেইশ চব্বিশ বছর আগে।

সরকার নিয়ে নেবার পর খনির চেহারা কত যে বদলেছে ধারণা করা যায় না। এখন হয়েছে মাথায় দেবার হেলমেট, যাতে অসাবধানে সুড়ঙ্গে মাথা ঠুকে না যায়। তার সঙ্গে বাতি লাগাবার আংটা। কোমরে বেল্টের সঙ্গে লাগানো ভারী ব্যাটারি। চার্জঘরে দিনরাত ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে। মাইনে তো বেড়েইছে, সেইসঙ্গে চাকরিতে এসেছে স্থায়িত্ব।

ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি সকালের সেমিনারে না থাকায় আমাদের ওপর সবাই খাপ্পা। জ্যোতি নাকি অসাধারণ ভাল বলেছে।

এদিকে তার আগেই হয়ে গেছে এক কাণ্ড। সকালে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি দুদিকের বাড়িগুলোর নাকমুখ কারা যেন রাতারাতি কেটে দিয়ে গেছে। রাস্তায় ইঁটসিমেণ্ট পড়ে চারদিক লণ্ডভণ্ড।

লোকমুখে শোনা গেল, রাত তিনটেয় পূর্ত বিভাগের বুলডোজার এসে সব সাফ করে দিয়ে গেছে।

নেতাজী সুভাষ রোডে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা হল। তিনি তাঁর দুঃখের কাহিনী বললেন। বাড়ি ভাঙার দরুন তাঁর ডিস্পেন্সারি বন্ধ। নতুন করে সব ঢেলে সাজাতেও ঢের সময় লাগবে। ততদিন রোজগারপাতি বন্ধ। একজনের নার্সিং হোম ছিল। তাঁর অবস্থা আরও সঙ্গিন। দেখেশুনে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল। এর উল্টোপিঠের ছবিটা পাওয়া গেল তামাক ব্যবসায়ী নন্দীমশাইয়ের কাছে। তিনি একসময়ে ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার।

বললেন, বাড়ি ভাঙার কথা বলছেন? ও সমস্তই সরকারের জমি খানিকটা বেদখল করে তৈরি। অনেক জায়গায় নিয়ম আছে ড্রেনের পাশে তিন ফুট ছাড় দিয়ে বাড়ি করার। সেইমত নকশা পাশ করাতে হয়। কেউ কেউ ড্রেন ঘেঁষে তিন ফুট উঁচু ভিত করে।

তারপর ঘরে ঢোকার বাহানা তুলে দূর থেকে ড্রেনের ওপর দিয়ে সিঁড়ি বানায়। ড্রেনের ওপর দিয়ে তুলে দেয় ঘরের বারান্দা। আর পাঁচ জায়গার মতন রাণীগঞ্জ পৌরসভাতেও বন্দোবস্তের অবশ্যই একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু রাস্তা বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই বেআইনী।

তিনি এও বললেন, এর মধ্যে কিছুটা 'কিন্তু' আর 'তবে' আছে। যদি শুধু ভাঙার জন্যে ভাঙা হয়, তাহলে এতে কোনো লাভ নেই। রাস্তা যদি চওড়া না হয়, ড্রেন আর পোস্টগুলো যদি সরানো না হয় —তাহলে শুধু শুধু ভাঙাভাঙি করা কেন ? কেননা এর ফলে, যাদের বাড়ি তারা ছাড়াও ছোট ছোট দোকানদাররা পথে বসবে। যেমন হয়েছে আসানসোলে। বাড়িগুলো ভেঙে দিল কিন্তু রাস্তার কোনো উন্নতি হল না।

নন্দীমশাই আজন্ম মানুষ এই কয়লাখনির দেশে। তিরিশ সালের বিশ্ব-অর্থনীতির সংকটে কয়লার ব্যাবসা প্রচণ্ড মার খায়। তাছাড়া নিজেদের কোলিয়ারি নেই। কাজেই বি এ পাশ করে মাইনিং পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে বিড়ির ব্যাবসায় নেমে পড়েন। তাতে পয়সা-কড়িও হয়েছে।

ওঁর কাছে এ শহরের নানা অভাব-অভিযোগের কথা শুনলাম। রাণীগঞ্জে এখনও সেই আদ্যিকালের খোলা ড্রেনেজ। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর বেয়াড়াভাবে জমি কেনা-বেচর ফলে, আগে যেখানে জলনিকাশি হত সেখানে টপাটপ বাড়ি উঠে গেছে। শহরের বেশির ভাগ জল এখন পুকুরে গিয়ে পড়ে। শহর উঁচুনিচু বলে এই বে-বন্দোবস্তেও কোনরকমে তরে যাচ্ছে। কিন্তু আবার শুরু হয়েছে মশার উপদ্রব। আর সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া।

কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, পৌরসভা শুধু শহরের করদাতাদের টাকায় চলতেই পারে না। শহর এলাকার বাইরে যারা থাকে তারা বিনা পয়সায় শহরের সুখসুবিধাগুলো ভোগ করে।

রাস্তার কথাই ধরুন না। কাগজকলের সমস্ত গাড়ি লরি শহরের ওপর দিয়ে যায় আসে। তার জন্যে পৌরসভাকে কোনো ট্যাক্স তাদের দিতে হয় না। তাছাড়া বাইরে থেকে অনবরত গাড়িঘোড়া আসছে।

ফলে গাড়ির মারে রাস্তা অষ্টপ্রহর ক্ষয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দরুন সরকার অবশ্য পৌরসভাকে কিছু টাকা দেয়। কিন্তু সেও দেয় পৌর-সভার রাস্তার দৈর্ঘ্য হিসেব করে, কতটা ব্যবহার হচ্ছে সে হিসেবে নয়।

কিন্তু ধরুন, সোনামুখী বা দাঁইহাট পৌরসভার রাস্তা যদি সমান লম্বা হয় তাহলে তারাও পাবে রাণীগঞ্জের সমান হারে টাকা। কিন্তু কটা গাড়ি সে রাস্তায় যায় ?

রাণীগঞ্জে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অন্য যে-কোনো পৌরসভার চেয়ে বেশি। অন্য জায়গায় একবার রাস্তা সারালে পাঁচ বছর চলে যায়। এখানে তা হওয়ার উপায় নেই। চাকার মার খেয়ে রাস্তা এখানে অনবরত ক্ষয়ে যায়। আজকের দিনে এক কিলোমিটার রাস্তা ভালভাবে সারাতে এক লাখ টাকা লাগে। সরকার সে বাবদে কত দিচ্ছে ? হয়ত হাজার পাঁচেক টাকা।

নন্দীমশাই বললেন, এখন আবার হয়েছে গোদের ওপর বিষ-ফোড়া। রাণীগঞ্জ ভারি বিপজ্জনক জায়গা, এই ধুয়ো তুলে উন্নয়নের সব কাজ ঠেকিয়ে দেওয়া। কয়লা তুলে ফাঁকা জায়গায় জল বালি দিয়ে ভর্তি করা থাকলে ধ্বসবার ভয় কম।

ও'র অভিযোগ, ধ্বস যদি হয় তো তার জন্যে ঈস্টার্ন কোলফিল্ডস্‌ই হবে দায়ী। কেননা জল সরিয়ে ওঁরা নিচের স্তর থেকে কয়লা টানছেন। এর ফলে ওপরকার খালি স্তরগুলোর জল নেমে গিয়ে হিতে বিপরীত হবে। তাছাড়া রাণীগঞ্জের খুব কাছাকাছি জায়গায় ওপর থেকে কেটে তোলার জন্যে সন্ধ্যের পর তাঁরা এমন ব্লাস্টিং করছেন যে শহরের দরজা জানলা কেঁপে ওঠে। একেকটা খোঁড়া খাদ পঁচিশ-তিরিশ ফুট নিচু। বেড়া দিয়ে না ঘেরার ফলে দুজন লোক

অন্ধকারে গর্তে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এসব খাদ মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে দেওয়াই হল নিয়ম। তা না হয়ে খাদগুলো জলে ভরে যাচ্ছে।

ওঁর ধারণা, রাণীগঞ্জের নিচে খুব ভাল জাতের কয়লা আছে। সেটার লোভেই শহর ধ্বসে যাওয়ার ধুয়ো তুলে লোক ওঠাবার চেষ্টা হচ্ছে। ওপরে যেখানে কলকারখানা ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়ে দু শো কোটি টাকার সম্পদ, তার চেয়ে নিচের কয়লাটুকুই কি বেশি দামী হল? তাছাড়া কয়লা তো এখনও বেরোচ্ছে। নারায়ণপুরীর ওপারে বাঁকুড়াতেই তো আকছার কয়লা প ওয়া যাবে।

এ ব্যাপারে আমার কথা হল একটাই। অন্যে সবে কথা কবে, সরকার রবে নিরুত্তর—এক্ষেত্রে সেটা চলে না। এখুনি এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার, নইলে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর তো হতেই পারে!

মাটির কাজ মাটি না হয়

বাসের শেষ স্টপ শিকারপুর। পুলিশ ফাঁড়ি পেরোলেই ভৈরব। ওপারে বাংলাদেশ। এক সময়ে নাকি খুব গমগমে ছিল। মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির দেড়শোর ওপর মহালের এখানেই ছিল খাসকুঠি। থাকত সব বড় বড় সায়েবসুবো। ক্র্যাফোর্ড, সামারভিল, বোর্নভিল।

করিমপুরে রাস্তায় বাসস্টপের ঠিক লাগোয়া যে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, তার গপ্পে মালিক আমাকে বলেছিল: তখন পুণ্যি বলে বছরে একটা দিন ধার্য থাকত। হালখাতার মত একটা দিন। প্রজারা খাজনা দিতে আসত। খাজনা দেওয়ার পর সায়েবদের কাছ থেকে পেত একটা করে শোলার মালা আর বাতাসা। জবর পার্বনী! ঐদিন খুব বাজিবোম ফাটত।

এখন আর শিকারপুরে দেখবার কিছু নেই। একটা ডাকঘর, বিডিও আপিস আর ইস্কুল বাড়ি। দু-দশ ঘর লোক। ব্যস, এই নিয়ে শিকারপুর।

খুঁজতে খুঁজতে একটা ঝুপড়ির মধ্যে পেয়ে গেলাম পাইস হোটেল। দু টাকায় ভাত মাংস। একেবারে গোয়ালন্দের ইস্টি-মারের স্বাদ।

খেয়েদেয়ে বাসে বসে অপেক্ষা করছি। আমার ঠিক পাশে এসে বসল কাছাকাছি কোনো গাঁ থেকে আসা এক ছোকরা। দুদিন

আগে এ অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে। সেই ঝড়ের রাত্রে ওপার থেকে একদল লোক এসে ওদের গরুগুলোর মুখ বেঁধে গোয়াল খালি করে নিয়ে চলে গেছে। ওর এক ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওপারের গো-হাটায়। গরু যদি দেখিয়ে দিতে পারে, তাহলে ওপারের পুলিশ সে গরু ফেরত পাবার ব্যবস্থা করে দেবে। দুদেশের সীমান্ত পুলিশের মধ্যে সরকারীভাবে এ ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া আছে।

বর্ডারের গাঁগুলোতে নিত্যি লেগে আছে এই ফ্যাচাং।

একশো কিলোমিটারের কিছু কম কৃষ্ণনগর থেকে শিকারপুর। এ রাস্তায় আগে কখনও আসি নি।

কৃষ্ণনগরে আমাকে একজন কথায় কথায় বলেছিলেন, 'এখনকার কেষ্টনগরকে বুঝতে হলে আপনাকে একবার বাসে করিমপুর ঘুরে আসতে হবে। এ শহরে যত নতুন চোখ-ধাঁধানো হাল-ফ্যাশানের বাড়ি দেখছেন সবই ঐ বর্ডারের পয়সায়। করিমপুরের রাস্তায় মাঠেজঙ্গলে ওদের সব পাকা দালানকোঠা আছে। সেখানে আছে এয়ারকুলার, রেফ্রিজারেটার, বিলিতি মদ। আর সেই সঙ্গে মনোরঞ্জনের সমস্ত রমণীয় ব্যবস্থা। নিজেরা যাতে ধরা না পড়ে তার জন্যে এইভাবে তারা পরের চোখমুখ চাপা দেয়।'

আরেকজন বলেছিলেন, 'বর্ডারের ধার ঘেঁষে এই যে রাস্তা, এখান দিয়েই এখন কলকাতা-দিল্লি-পাঞ্জাব-বোম্বাইতে মেয়ে চালানের রমরমে ব্যাবসা চলেছে। আসে ওপার থেকে। হিন্দু কি আর মুসলিম কি। গতর দিয়ে কিছু পয়সা কামিয়ে ফিরে যায়। আবার আসে। ওখানকার পাড়াপড়শিরা জানতে পারে না এখানে কী ঘটছে। ফলে লোকনিন্দেরও তেমন ভয় থাকে না।'

মেয়ে ধরার এই ব্যাবসায় ভিজেবেড়াল এক কম্পাউণ্ডার নাকি

বিস্তর পয়সা কামিয়েছে ; নইলে ওই কম্পাউণ্ডারি করে পেল্লায় বাড়ি হাঁকানো তো সহজ কথা নয়।

তেমনি ভেবে দেখুন মফস্বল শহরের সেই বাঙালী ব্যাবসাদারের কথা, যার আয়কর সাব্যস্ত হয়েছিল আশী লক্ষ টাকা এবং শেষ পর্যন্ত একুশ লক্ষ দিয়ে যিনি রেহাই পান।

এসব যদি না হবে, তাহলে এত সোনার দোকানই বা গজিয়ে উঠল কেন। বাসের জানালা দিয়ে আমার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে থাকে। যে-সব দালানকোঠার কথা শুনেছিলাম সে রকম ঠিক চোখে পড়ে না।

অবশ্য করিমপুরের কথা আলাদা। এক সময়ে ছিল নেহাত গণ্ডগ্রাম। এখন তো আধা শহর। মারোয়াড়ীদের বড় বড় পাটের গুদাম। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। আর সেই সঙ্গে খুলছে পাইকারী আর খুচরো দোকান।

একজন বলল, 'চোরাচালানের ব্যাবসা এখন আর ঠিক আগের মত নেই। ইমার্জেন্সির পর থেকে মন্দা।'

পাটে আর ধানে সবুজ হয়ে আছে দু-পাশের ক্ষেত। কোথাও দূরে ঝিলিক দেয় নদী কিংবা খাল কিংবা বিলের রোদে-ঝলসানো জল। থেকে থেকে মুসলমান আর খৃস্টানদের কবর। প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ। শ্যালো কিংবা গভীর নলকূপ। আচমকা এক গম্বুজঅলা মোকাম। আর ইঁটখোলা।

চাপড়ায় এসে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। এ-সব দিকে জলে নয়, ডাঙায় ডাঙায় বর্ডার। তারপর আর একটু গেলেই আমাদের ফেলে-আসা গ্রাম। হঠাৎ খুব মন কেমন করে।

বাস ঘুর্নিতে আসতেই টুক্ করে নেমে পড়ি।

শেষ এসেছিলাম বছর পনেরো-ষোল আগে। তখনকার চেয়ে এখনকার চেহারা খুব কিছু বদলায় নি।

কার্তিক পাল, মুক্তি পাল তো ছিলেনই। নতুনের মধ্যে এখন উঠতি ভাস্কর গৌতম পাল। রাস্তার বাঁদিকে তার নাম-লেখা নতুন স্টুডিও। গৌতম শুধু মূর্তি গড়ে না, ছবিও আঁকে।

আগের বার যখন এসেছিলাম মুক্তি পালের তখন কম বয়স। ওঁর খুব শখ ছিল বিদেশে যাবার। সে সুযোগ আর হয়ে ওঠে নি। এর মধ্যে ওঁর পশার বেশ বেড়েছে। এখন বেশ বড় শো-রুম আর সেলিং কাউণ্টার।

এ ক' বছরে মৃৎশিল্পীদের ঘর তো বাড়েই নি, বরং কমেছে। পেটের দায়ে অনেকে নিয়েছে বাঁধা মাইনের চাকরি, কেউ হয়েছে মোটর গাড়ির মিস্ত্রি। তেমনি পুতুল তৈরি ছেড়ে অনেকে করছে অন্য ধরনের মাটির কাজ।

বিলিতি রং একে পাওয়া শক্ত, তার ওপর দাম বেশি। কাজেই এখন কাজ করতে হচ্ছে দেশি রঙে। রং যে পাকা হবে, এ গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। সমবায় ছিল। উঠে গেছে। খোলা-বাজারে চড়া দামে খড়ি কিনতে হয়।

কার্তিকবাবুর সঙ্গে কথা বলে মনে হল, পুতুলের বাজার খুব খারাপ নয়। কিন্তু বাজারে যা চলছে তাকে ঠিক সাবেকী অর্থে 'কৃষ্ণনগরের পুতুল' বলা যায় না। এখন চলছে ছাঁচে-ঢালা জিনিস। প্রত্যেকটা আলাদাভাবে তৈরি অনন্য যে নিখুঁত পুতুল, তার কারিগর আজও মরে যায় নি। কিন্তু কে তার কাজের দাম দেবে ?

সমস্যা তো সেখানেই।

বড় করে একটা সমিতি ফেঁদে মুশকিল আসানের একটা উপায়ের কথাও কার্তিকবাবু ভেবেছেন। যাঁরা সেরা শিল্পী, তাঁরা মাস মাইনে নিয়ে দিনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা সমিতির স্টুডিওতে কাজ করবেন। বাকি সময় তাঁরা কাজ করবেন নিজের নিজের স্টুডিওতে। ছাঁচের কাজ করবেন অন্যান্য কারিগররা। তার দরুন তাঁরা উপযুক্ত মাসোহারা

পাবেন। সমিতির থাকবে আলাদা প্রদর্শনী-ঘর, সেলিং কাউণ্টার আর পুরনো ভাল কাজের সংগ্রহশালা।

সকলের স্বার্থে সবাই এক হওয়া আর তার পেছনে সরকারকে সহায় হিসেবে প্যাওয়া—এই মণিকাঞ্চন যোগ হলে তবেই কার্তিক-বাবুর স্বপ্ন সফল হতে পারবে।

কিন্তু তাঁর ছেলে গৌতমের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, এর পরেও যেটা থেকে যাবে, সেটা হল শিল্পের সমস্যা। তার সমাধান সহজে হওয়ার নয়।

আর্ট কলেজের পড়া শেষ করে গৌতম গিয়েছিল ইতালিতে ভাস্কর্য শিখতে। তার মতে, কৃষ্ণনগরের প্রথাগত মৃৎশিল্পকে বাস্তববাদী বলা ঠিক নয়। আসলে তা অন্তঃপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে বহিঃপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণ। এটা ঘটেছে ইংরেজদের প্রভাবে। আদত লোকশিল্পের জাত আলাদা। যেমন বাঁকুড়ার ঘোড়া। চোখ লাগিয়ে বস্তুর শুধু বাইরেটা দেখা নয়, মন লাগিয়ে তার ভেতরটাকে দেখা। ভেতরের ছন্দকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা। সৃষ্টির কাজে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিই হল আসল।

ঘুর্নির মৃৎশিল্প যেখানে এসে পুনরাবৃত্তির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, গৌতম চায় তাকে নতুন খাতে বইয়ে দিতে। যাতে সৃষ্টির ধারায় অবাধ গতি পায়।

সেই সঙ্গে প্রকৃতিকে নকল করার কাজও চলুক। ভারতের নানা জাতি-উপজাতির মানুষ, তাদের ঘরবাড়ি, পোশাক পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা—এইসব নানা জিনিস নিয়ে পুতুল হোক। সেটা লোকশিক্ষার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। দেশবিদেশের সেরা ভাস্কর্যের মৃণ্ময় প্রতিরূপও তো গড়া যেতে পারে। কেনার ব্যাপারে ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানের ওপর জোর পড়ুক। তাহলে বাজারের অনিশ্চয়তা আর রুচির নিম্নগতি রোধ করা যেতে পারে।

ঘুর্নিতে মৃৎশিল্পীরা এসে বসবাস শুরু করেন দুশো আড়াইশো বছর আগে। তার আগে তাদের নিবাস ছিল নাটোরে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এঁদের আনান। এই মৃৎশিল্পীরা লালগোলা, নসিপুর আর কাশিমবাজারের রাজাদেরও পৃষ্ঠপোষকতা পান। ইংরেজ শাসকদের আনুকূল্যে এঁদের কারিগরি দক্ষতার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষ্ণনগরে এখন মোট শ খানেক ঘরে পুতুলের কাজ হয়। ঘুর্নিতেই অধিকাংশ কারিগরের বাস। বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন ষষ্ঠীতলায় আর আনন্দময়ীতলায়। এঁদের সবার তৈরি জিনিস বছরে প্রায় তিন লাখ টাকার মত বিক্রি হয়। এর মধ্যে পুরোটাই মাটির নয়—কিছু আছে পাথর আর অন্যান্য উপাদানের।

সমবায় না থাকায় এখন এই শিল্পের পুরোটাই ব্যক্তিগত মালিকানা-নির্ভর। শিল্পগত দক্ষতা সকলের সমান নয়। যাঁরা সেরা কারিগর, তাঁদের পেছনে আছে সমানে আট পুরুষ ধরে এ কাজের ঐতিহ্য। তাঁদের আছে নিজেদের শো-রুম আর বিক্রির কাউন্টার। যাঁদের সামর্থ্য কম, তাঁরা এঁদের মারফত নিজেদের জিনিস বিক্রি করেন। কেউ কেউ মজুরি নিয়ে অন্যদের কাছে কাজ করেন। তার মধ্যে যাঁরা অদক্ষ, তাঁরা করেন মাটি তৈরি, মাটি ছানা আর ভাঁটিতে আঁচ ধরানোর কাজ। তাঁদের রোজ সাড়ে চার টাকার মত।

ষষ্ঠীতলা আর আনন্দময়ীতলার মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা গড়ার কাজও করে থাকেন। ঘুর্নির কিছু মৃৎশিল্পী পেট চালানোর জন্যে মাঝে মধ্যে খোয়া ভাঙার কাজও করেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা কাজ করেন এঁটেল আর বেলেমাটি দিয়ে। আগে জলঙ্গী বা খড়ে নদীর ধারের মাটিই ছিল তাঁদের কাজের প্রধান উপাদান। কিন্তু পাড় ভাঙার দরুন এখন আর জলঙ্গী থেকে মাটি নেওয়া হয় না। স্থানীয় অভিজ্ঞ যোগানদাররা আশপাশ থেকে মাটি এনে দেয়।

সেই মাটি চৌবাচ্চায় সপ্তাহখানেক রেখে দিয়ে তারপর ছেনে পচিয়ে দলাই করা হয়। তারপর গড়ন দিয়ে ছাঁচ ঢালাই। তারপর ছাঁচে ডোবানো। প্রথম পর্বে এইভাবে হয় পুতুল সারার কাজ। স্বাভাবিক আবহাওয়ার তাপমাত্রায় তাকে শুকোতে হবে। তারপর সিরিস কাটা আর জলতুলি বুলোবার পর পোয়ানে পোড়ানো। পোড়ানোর পর ফাটা সারাই আর সিরিস কাটার কাজ। তারপর রং দেওয়া, চকচকে করা, চোখ অাঁকা। এসব হয়ে যাওয়ার পর চুল লাগানো, পোশাক পরানো, গয়না পরানো।

ছাঁচে তৈরি পুতুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে নামকরা সাবেকী পুতুলগুলো এখনও আলাদা আলাদাভাবে হাতে গড়া হয়।

পুতুল তৈরিতে লাগে মাজাখড়ি, গিরিমাটি, সিঁদুরে রং, ডেলা নীল, ভুষো কালি, ফরসা তামা, খুনখারাপি, পোড়ামাটি আর সেইসঙ্গে আরও বহু বিচিত্র রং। লাগে সাজপোশাক, পাট, দড়ি, নাইলনের সুতো, তার, বাঁশ, কাঠের টুকরো আর প্যাকিংয়ের জিনিস। যন্ত্রপাতির মধ্যে লাগে কোদাল, হাতুড়ি, ছুরি, বাঁশের চিয়ারি, বালতি, ঝুড়ি আর খুব ভালো তুলি। তাছাড়া প্ল্যাস্টার মোল্ডের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় প্ল্যাস্টার অব প্যারিসের চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে।

তৈরি করতে যা খরচ হয় তার শতকরা ৯৪ ভাগ চলে যায় মালমশলা কিনতে আর বাকিটা যায় মজুরি দিতে আর সুদ গুনতে। পুরো কাজটা বাড়িতে বসে হয় বলে খরচের মধ্যে বাড়ি-ভাড়াটা ধরা হয় না।

সাবেকী যেসব পুতুল এখনও তৈরি হয়, তার মধ্যে আছে: দেবদেবী, মানুষজন, ফল, তরিতরকারি, চিনেবাদাম, বিস্কুট, পোকামাকড়, মাছ, পাখি, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সুপুরি, কাটাসুপুরি, চিংড়ি, টিকটিকি, গ্রাম্যজন, বৈষ্ণব, বাউল, চাষী, পূজারী ব্রাহ্মণ, সাঁওতাল, নর্তকী, রাজস্থানী মেয়ে, স্নানরত রমণী—এমনি কত কী। এর কিছু কিছু দিয়ে এককালে জামাই ঠকানো হত।

দেশের ভেতর থেকে পুতুলের যেসব অর্ডার পাওয়া যায় তার পরিমাণ মোট বিক্রির শতকরা প্রায় ষাট ভাগ। সরকারী সংস্থা, ব্যাবসাদার, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে অর্ডার দেন। তাও বারো মাস মেলে না। সরকারী অর্ডার ইদানীং তেমন আসছে না। বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, জয়পুর থেকে কখনও কখনও ব্যবসায়ী বা ব্যক্তিবিশেষের মোটা অর্ডার আসে।

বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ বছরে মোট বিক্রির শতকরা তিন ভাগের বেশি নয়। আগে কৃষ্ণনগরে বিদেশী টুরিস্ট আসত, সাতষট্টি সালের পর তাদের আসা কমে গেছে।

রাজারাজড়ারা পৃষ্ঠপোষক থাকায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের আগে কখনও বিক্রির সমস্যায় পড়তে হয় নি। বাজারের সমস্যা এখন খুব প্রবল।

তাছাড়া পুতুল তো আর নিত্যব্যবহার্য জিনিস নয়। কাজেই এর বাজার স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধ। মাটির জিনিসের যেমন ওজন বেশি, তেমনি চট্ করে ভেঙেও যায়। ফলে পথে ভেঙেচুরে লোকসান যাওয়ার ভয়ে ব্যবসায়ীরা অর্ডার দিতে ভয় পায়।

ঘুর্নিতে বসে থাকতেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে কী হবে, আলো এত কম যে ছবি তোলা সম্ভব নয়।

ঘরের মধ্যে বসে ছিল দিলীপ বল্লভ। গৌতমের বন্ধু। ভাল ফটোগ্রাফার। কৃষ্ণনগরে ওর স্টুডিও আছে।

নিরুপায় হয়ে দিলীপকে ধরে বসলাম। দিলীপ কথা দিল পুতুলের ছবি পাঠাবে। দেখা যাক।

নদেয় এল বান

কৃষ্ণনগরে পা দিয়েছি কি বৃষ্টি।

সার্কিট হাউসে ঠাঁই না পেয়ে ভিজতে ভিজতে বাসশ্রীতে গিয়ে উঠলাম। জায়গাটার খুব একটা শ্রী আছে এ-কথা বলা যায় না।

পশ্চিম বাংলায় মফস্বলে কম পয়সায় থাকার মতন আধুনিক রুচি-সম্মত হোটেল এখনও আমার নজরে আসে নি। পূর্ত, সেচ বা বন-বিভাগের বাংলোর কথা আলাদা। কোথাও কোথাও অনুমোদিত পেয়িংগেস্ট গোছের ব্যবস্থা থাকলেও মন্দ হয় না।

তবু তো কৃষ্ণনগরে একটা দুটো বোর্ডিং হাউস আছে। কিন্তু শুনলাম শান্তিপুরে আদৌ নেই। যানবাহনের দুর্যোগে কেউ যদি সেখানে একবার আটকে পড়েন, তাহলে রাস্তায় থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় থাকবে না।

সকালে গোপালদার সঙ্গে দেখা হতেই আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। এ শহরে ওঁদের তিন পুরুষের বাস। আগে বাড়ি ছিল বনগাঁর দিকে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, শহরের আদি বাসিন্দারাও সবাই এসেছে কাছের কিংবা দূরের গ্রাম থেকে। কেউই বরাবর এখানকার নয়।

নানা জায়গার লোক এসে এক জায়গায় পুরুষানুক্রমে থাকার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে সেই জায়গার বিশেষ ঐতিহ্য। চলনে বলনে পড়ে একটা আলাদা ছাপ।

মিলেমিশে একাকার হওয়ার এই প্রক্রিয়া কখনও থেমে যায় না। জীবনের গতির সঙ্গে পা ফেলে চলতেই থাকে।

কথাটা কেন মনে হল বলি।

সব বাঙালীর কাছেই কৃষ্ণনগরের মুখের কথার খুব আদর। প্রমথ চৌধুরী মোটের ওপর একেই বাংলা ভাষার ছাঁচ করতে চেয়েছিলেন।

আমার মা কৃষ্ণনগরের মেয়ে। ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরে গেলে আমিও মুগ্ধ হয়ে শহুরে মানুষদের কথা বলা শুনতাম। মিষ্টতার সঙ্গে মেশানো থাকত বুদ্ধির ধার।

এখনও কি কৃষ্ণনগরের সে ঐতিহ্য বজায় রয়েছে?

এ সন্দেহ জাগবার কারণ আছে। নদীয়ার এখন মোট লোক-সংখ্যার আধাআধি বহিরাগত। তারা কেউ উত্তরবঙ্গের, কেউ পূর্ব-বঙ্গের লোক। কাজেই এই বিপুল জনসংখ্যা নদে-শান্তিপুরের ভাষার ওপর ছাপ-তো ফেলবেই।

কৃষ্ণনগরে বয়স্কদের মধ্যে যাঁকেই আমি জিগ্যেস করেছি তিনিই বলেছেন, সে ভাষা এখন আর নেই।

ভাষা বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা একটু বিশদ করে নেওয়া ভাল।

এক তো হল উচ্চারণ। ওঁদের অনেক উচ্চারণই ঠিক বানান অনুযায়ী নয়। যাঁরা খাস কৃষ্ণনগরের লোক, তাঁরা কেউই 'কৃষ্ণ' বলবেন না। হয় বলবেন 'কেষ্টনগর', নয় স্রেফ 'কেশ্‌নগর'। অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় তাই পাওয়া যায় 'কেশ্‌নগরের মশা'।

এ-কারকে ই-কার আর ছ-কে চ করার ঝোঁক ওঁদের মধ্যে বেশি। করেছি-কে বলেন করিচি, বলেছি কে বলিচি। বলার টানে আমিও হয়ে যাই আম্মো। হয়নি-কে অনেকেই হোইনি বলেন। লেপ নেপ লেবু নেবু এ তো আছেই। আম-কে আঁব বলতেও শোনা যায়।

কৃষ্ণনগরের লোকের মুখে ট বা ফ-র জায়গায় ম-যুক্ত দ্বিত্বের বেশ

আধিক্য দেখা যায়। যেমন: ঘোলা-মোলা, খিচুড়ি-মিচুড়ি, জল-মল, জেল-মেল, শাক-মাক, দাড়ি-মাড়ি। দ্বিত্বে ট বা ফ-র ব্যবহার একেবারে নেই এমন নয়।

কুচুবাবুর বৈঠকখানায় বসেও এই একই বিষয়ে কথা উঠল। বললেন, শহরের যারা সাবেকী বাসিন্দা, তাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কথার ধরন অনেক বদলেছে। 'সঙ্গে'র বদলে তারা এখন নির্বিকারভাবে বলে 'সাথে'। 'ওঁর' বা 'ওঁকে' না বলে 'ওনার' বা 'ওনাকে' বলে। মশারি 'টাঙানো' না বলে মশারি 'খাটানো' বলে। 'গিয়ে'র বদলে বলছে 'যেয়ে'। 'সে এলো'-র বদলে 'সে আসলো' কিংবা 'সে এলে'-র বদলে বলে 'সে আসলে'।

কৃষ্ণনগরের ভাষায় শুধু যে পূর্ব বাংলার ছোঁয়াচ লাগছে তা নয়। অনেক পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে কাজে লাগানো হচ্ছে। বাজারে গিয়ে কেউ যদি বলে, 'এ যে দেখছি বিপরীত মাছ', তাহলে বুঝবেন 'বিরাট' অর্থে এখানে 'বিপরীত'-এর প্রয়োগ।

ছেলেবেলায় দেখেছি কৃষ্ণনগরের লোকজনদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক রসবোধ ছিল। অনেকেই খুব রসিয়ে কথা বলতে পারতেন।

আগেকার রসকষ এখন আর তেমন কানে আসে না। মজার মজার ধরতাই বুলিও আর শোনা যায় না।

কুচুবাবুর ছেলে মিঠু বলল, এখনও কিন্তু ছোটদের মুখে বেশ মজার মজার কথা শোনা যায়।

কি রকম?

যেমন, একটি ছেলে তার বন্ধুকে ডাকতে তাদের বাড়িতে গেছে। তাকে বলা হল, ও তো এখন পড়ছে। ডাকব?

ছেলেটি তার উত্তরে বলল, না, থাক—অফ্ করে দিন।

অর্থাৎ, থাক—দরকার নেই।

এক বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসেছে। গাইতে গাইতে

একজনের গলা পড়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট ছেলে বলে উঠল, ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে।

মিঠু বলল, স্নানে বা স্থানে স-র যে উচ্চারণ, এখন শহরের রাস্তাঘাটে কমবয়সীদের কথায় সেই স-র ভাগ খুব বেশি। তার চেয়েও বড় কথা, মুখে তাদের কোনো রাখ-ঢাক নেই। এমন এমন সব কথা বলে যা শুনলে আমাদেরও কান লাল হয়ে ওঠে। অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের বয়সের সামান্যই ফারাক। আমাদের সময়ে এ রকম ছিল না। বাড়ির শিক্ষায় যেখানে গলদ নেই সেখানেও এ জিনিস ঘটছে।

ও বলতে চায় হাওয়ার দোষ।

বাইরে থেকে ঘা খেয়ে মনের গড়নও বদলায়। শব্দের ব্যাপারে আগের মত স্পর্শকাতরতা আর থাকে না। অর্থ হারিয়ে অনেক শব্দই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে অকপটে তারা এমনসব কথা মুখে আনে যাতে ভণ্ডামির ভদ্র মুখোস খসে যায়।

হাওয়ার মধ্যে দোষগুণ দুই-ই আছে।

সে যাই হোক, সময় বয়ে যাচ্ছে। কারো কিছু করা উচিত, কিছু হওয়া উচিত।

আনন্দময়ীতলা পেরিয়ে কৃষ্ণনগরের গায়ে গা দিয়ে মাথা তুলেছে শক্তিনগর। এর পত্তন আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে দেশ ভাগের পর।

এক সময়ে ছিল বাঘডাকা জঙ্গল। সাপের ভয়ে লোকে এদিক বড় একটা মাড়াত না।

সাহসে ভর করে প্রথমে এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজেছিলেন পাবনার হেমায়েতপুর থেকে আসা একদল উদ্বাস্তু।

যাদের এখন তিরিশ বছর বয়স তারাও জানে না এক সময়ে কী কষ্টে এখানকার লোকের দিন গেছে। প্রথমে খোলা আকাশের

তলায়। তারপর আস্তে আস্তে দরমার বেড়া, টিনের চাল আর ছাপরার ঘর। পরে এসেছে অন্য পাঁচ জায়গার লোক।

আজ প্রায় সকলেরই পাকা বাড়ি। অবস্থা ফিরে যাওয়ায় কারো দোতলা তিনতলা বাড়ি হয়েছে।

বাড়িতে বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো। কলের জল। সুন্দর রাস্তাঘাট। উঠোনে ফলের গাছ। মাচায় লতিয়ে ওঠা লাউ-কুমড়ো।

কোথাও গেঞ্জির কল। কোথাও গম-ভাঙা মেশিন। রকমারি সওদার দোকান। সরকারের মাছের দীঘি। হাসপাতাল। সব মিলিয়ে গম গম করছে শক্তিনগর। এখানে প্রাইমারি ইস্কুলই আছে চোদ্দটা। তাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের দু দুটো মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

গিয়ে পড়েছিলাম অবেলায়। তবু অতিথি আপ্যায়নের ঠেলায় নাজেহাল হতে হল। চা-মিষ্টি না খাইয়ে কেউ ছাড়বে না।

ছিলাম সামান্য একটু সময়। দেখা গেল, বাইরের লোককে এখানকার মানুষ দু দণ্ডেই আপন করে নিতে পারে।

সাইকেল রিক্সায় রাজবাড়ির ভেতর দিয়ে আসতে আসতে মনে হল কৃষ্ণনগর কি রকম যেন বুড়িয়ে গেছে। তার পাশে শক্তিনগর ঢের বেশি জোয়ান। ঢের বেশি জীবন্ত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই কৃষ্ণনগর খুব বেশি আওতায় মানুষ হয়েছে। জিভ-টাকে সে যত ধারালো করেছে, দুর্বিপাকের মহড়া নেবার মত তার পাঞ্জার জোর তেমন বাড়ে নি।

জিভ বলতে সরপুরিয়া-সরভাজার কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়লে এখনও জিভে জল আসে।

নেদেরপাড়ায় অধর ময়রা আর এখন নেই। কার কাছে খবর নেব ?

স্বর্ণময়ী পুকুরের সামনেই এক মিষ্টির দোকান। সরপুরিয়া-সরভাজার ব্যাপারে জানতে চাই শুনে নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মুচকি মুচকি হাসলেন।

বললেন, সেকালের সেই সরপুরিয়া আর সরভাজা মাথা খুঁড়ে মরলেও আর পাবেন না। তার কারণ এ নয় যে, আগেকার মত কারিগর নেই বলে ঠিক সে জিনিস আর হচ্ছে না। আসলে যা দিয়ে আগে সরপুরিয়া তৈরি হত, সেসব জিনিস আপনি পাচ্ছেন কোথায়? আর যদিও পাওয়া যায়, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে সে সরপুরিয়া কিনবে? আমরা হিসেব করে দেখেছি যে, সাবেকী সরপুরিয়া তৈরি করলে পঁচানব্বই টাকা কে-জির কমে বেচা যাবে না। সেই বাজারে আমাদের কত দামে সরপুরিয়া বেচতে হয় জানেন? কুড়ি টাকা কেজি। তার বেশি হলে আমরা খদ্দেরই পাব না।

সরপুরিয়া সরভাজার জন্ম হয়েছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে। ময়রাদের ডেকে মহারাজা বলেছিলেন, তোমরা এমন কিছু করো যাতে সারা দেশে কৃষ্ণনগরের নাম ছড়িয়ে যায়। তাই হল। কিন্তু আগে সরপুরিয়ায় দেওয়া হত পেস্তা, জাফরান, কুচো মিছরির দানা, কাঠবাদাম—এইসব। এখন কাজুবাদামের ওপরে আর ওঠা যায় না। বাজারে ওসব আদত জিনিসের আগুন দাম।

আগে দেড় কে-জি সরপুরিয়া করতে কী কী লাগত শুনুন:

এক কেজি ছানা, এক কেজি ক্ষীর, এক ছটাক বাদাম, এক কাচ্চা পেস্তা, এক কাচ্চা ছোট এলাচ, এক ছটাক মিছরির দানা আর দুধে মেশাবার জন্যে জাফরান। তখন যে সর পাওয়া যেত তাকে বলা হত করতালি-সর। ওপর-নিচের সরের ওজন হত একশো গ্রাম। চার থাকে সর থাকত।

ছানাটা খুব মিহি করে সাজতে হত। তারপর তাতে ক্ষীর মেশাতে হত। কড়াইতে দেওয়া হত চারশো গ্রাম চিনি। চিনির সঙ্গে ফেটিয়ে নিয়ে উনুনে তাওয়ায় চড়ানো হত এমনভাবে যাতে তলা ধরে না যায়। ঘাঁটতে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময়

লাগত। পাক নামানোর পর দেওয়া হত দুধে গুলে জাফরান। ঠাণ্ডা হওয়ার পর বাদামপেস্তা মিশিয়ে সমানভাবে তিনটি তাল করলেই সরপুরিয়া তৈরির কাজ শেষ হত।

সরভাজা তৈরি হত করতালি-সর দিয়ে। তাতে দেওয়া হত নালি ক্ষীর। চারটে সরে একশো গ্রাম নালি ক্ষীর সরের ওপর মাড়িয়ে দিয়ে তার ওপর আবার সর চাপিয়ে দেওয়া। শুকিয়ে নিয়ে পিস্ করে কেটে নিয়ে ঘিয়ে ভাজার পর মোটা চিনির রসে ফেলে দেওয়া। এইভাবে তৈরি হত আসল সরভাজা। আগেকার দিনে আজকের মতন প্যাকেটের চলন ছিল না। মাটির হাঁড়ি না হলে ও জিনিসের স্বাদ গন্ধ ঠিক বজায় থাকে না।

আদত জিনিস পেলে আমরাই আপনাকে অবিকল আগের মত সরপুরিয়া সরভাজা করে দিতে পারি। কিন্তু ঐ যে বললাম —এ বছরে তার দাম পড়বে পঁচানব্বই টাকা কেজি।

মনে মনে বললাম, মাথায় থাক আমার সরপুরিয়া আর সরভাজা।

যাচ্ছি শান্তিপুরে। আকাশ কালো হয়ে আছে। থেকে থেকে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই ছড়ার কথা মনে পড়ল : শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।

নদীয়ায় মানুষের এক বান এসেছিল দেশভাগের পর। সেই বানে এর মাটিতে পড়েছে নতুন পলি। সেই পলিতে পড়ো মাঠগুলো সব সবুজ হয়ে উঠেছে।

সুতোর জটজঙ্গলে

শান্তিপুরে যায় যে মজাদার ছোট রেল, ইচ্ছে ছিল তাতে করে যাব। রাস্তার লোকে ভাংচি দিল। যাবেন না—মাঝ-রাস্তায় আজকাল প্রায়ই গাড়ি বিগড়ে যায়।

আগে তো ছোট রেলেই যেতাম। যেত ঝিকির ঝিকির করে। বেশ লাগত। মনে হত খেলনার ট্রেন।

লোকের এখন সময়ের দাম বেড়েছে। কাজেই ট্রেনের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি ভাড়া দিয়েও আজকাল বাসে যাতায়াতই বেশি পছন্দ করে। ছোট রেল দিনে মাত্র চারবার যায় আসে। তাছাড়া বাসে শহরের ভেতর অবধি যাওয়া যায়।

এদিকে ছোট রেলের লাইন বসেছে ১৮৯৮ সালে। রানাঘাট-লালগোলা ব্রাঞ্চ লাইন হয়েছে তারও আট বছর পরে।

তার আগে কৃষ্ণনগরের সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন ছিল বগুলা। হাঁসখালিতে ছিল চূর্ণী নদী পার হওয়ার খেয়াঘাট। এখন বাসের রাস্তা চারদিকে। হালে মিনিবাসেরও চল বাড়ছে।

কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর যাচ্ছি বহু বছর পরে। যেখানে বনজঙ্গল ছিল, সেখানে এখন লোকালয়। বৃষ্টির জল পড়ে লকলকিয়ে উঠেছে ধানের চারাগাছ! এ-সব দিকে এত পাটের চাষ দেশ ভাগ হওয়ার আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ভাতজাংলা পেরিয়ে দিগ্‌নগর। দিগ্‌নগরের মেয়েগুলো নাইতে নেমেছে—ছড়ার সেই দীঘির শহর দিগ্‌নগর। বাস থামিয়ে

ড্রাইভার ধাঁ করে পাশের এক কালীমন্দিরে পয়সা ফেলে দিয়ে আসে। বাগ-অঁাচড়ার মোড়ে এসে ছেলেবেলার সেই ভুলটার কথা মনে পড়ল। তখন বলতাম বাঘ-অঁাচড়া। আসলে কথাটা বাগ্‌—ওখানে বাগ্‌দেবীর পুজো হত।

দুপাশের বাড়িগুলো আরও বেশি পুরনো হওয়া ছাড়া শান্তিপুরের খুব বড় রকমের বদল কিছু হয়নি। নতুনের মধ্যে বাসযাত্রীদের একটা প্রতীক্ষালয় আর শিশু-উদ্যান। কলেজকে এখন আর কেউ নতুন বলবে না। অবশ্য আলাদা জায়গায় হয়েছে সিনেমা হাউস।

ডাকঘরের মোড়ে কিছু নতুন দোকানপাট, দু-একটা দালানকোঠা আর ব্যাঙ্ক হয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায় শহরে লোক বেড়েছে। ছেলে-ছোকরাদের কাজ জুটলে দিনে-দুপুরে অতটা ভিড় অবশ্য আর থাকবে না। এ-সব শহরে কাজের দিনগুলোতে লোক বাড়ে সন্ধ্যের পর, ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা ফিরলে।

হ্যাঁ, নতুনের মধ্যে হয়েছে রকমারি সরকারী আর আধা-সরকারী আপিস। বেশির ভাগই তাঁতশিল্প সংক্রান্ত। তার কারণ, এ শহরের অর্ধেক লোকেরই নির্ভর তাঁতশিল্প। তারা সবাই তাঁত বোনে এমন নয়। কিন্তু তাঁতশিল্পের সঙ্গে তাদের ভাগ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বাজারে যে আনাজ বেচে, রিক্সায় যে মাল টানে বা সওয়ারী বয়, দোকানে যে চা-বিস্কুট বেচে—সবারই ভালমন্দ নির্ভর করে তাঁতশিল্পের উন্নতি-অধোগতির ওপর। এ শহরে কলকারখানা বলতে আর কিছু নেই। তাঁতই হল একমাত্র লক্ষ্মী।

তাঁত বলতে আদিতে ছিল ঠকঠকি তাঁত। এল মাকু-টানা দোক্তি। এখন শহরের যেখানেই দাঁড়ান, সবসময় আপনার কানে আসবে ঠ-ক ঠক, ঠ-ক ঠক।

এই 'ঠক' কথাটা নিয়ে ছেলেবেলায় শান্তিপুরের পেছনে লাগতে পারলে ছাড়তাম না। বড় হয়ে 'পাঠক' কথাটা নিয়েও রগড় করতাম।

'পাঠক'কে লক্ষ্মী জ্ঞান করার পর থেকে সাবধান হয়েছি। লেখক হলে পাঠককে চটাতে নেই।

তাঁতে পুঁজি কম লাগে। তাই রোজগারের অন্য উপায় না পেয়ে বামুন-কায়েত-কামার-কুমোর সবাই এখন তাঁত চালাচ্ছে।

মনে পড়ল, আজ থেকে ষোল-সতেরো বছর আগে চুরাশি বছরের বুড়ো কারিগর ভূষণ প্রামাণিক আমাকে বলেছিলেন—চালের মণ যখন দু টাকা, তখনও বেশির ভাগ তাঁতীর অবস্থা খারাপ ছিল। হাতে মাকু চালাতে হত—কাজ ছিল শক্ত। তখন এক টাকা মজুরিতেও লোকে কাপড় বুনেছে। জ্যাকার্ড মেশিনে এখন কাজ তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু গায়ের জোর বেশি লাগে। আগেকার মতন সরেস কাজ এখন আর হয় না। লোকের এখন কাজ শেখার সময় কোথায়? পেট থেকেই পড়ে কাজের চিন্তা। আগে তাঁতীদের আঙুল ছিল মর্তমান কলার মত। টাকায় ছিল ষোল সের দুধ—একেবারে বটের আঠার মত। এখনকার ছেলেপুলেরা দুধ পায় না, চোখও খারাপ। কম বয়সেই পট পট করে মরে যাচ্ছে।

শান্তিপুরে পৌর এলাকায় এখন তাঁত চলছে সাড়ে বারো হাজারের মত। তার মধ্যে যত লোকের নিজের তাঁত আছে তার দেড়া লোক মজুরী খাটে মহাজনের তাঁতে। যত তাঁতী সমবায়ের মধ্যে আছে, তার পাঁচ গুণ আছে সমবায়ের বাইরে।

মহাজনেরা তাঁতশিল্পকে এখনও কিভাবে নিজেদের কব্জায় রেখেছে এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

শান্তিপুরের তাঁতীদের অধিকাংশই ধার-দেনায় ডুবে আছেন। ষোল আনার মধ্যে চোদ্দ আনা ঋণ মহাজনের কাছে।

আগেকার যে শান্তিপুরের শাড়ি, তার পাড় ছিল বিঘৎখানেক চওড়া। হয় কুচকুচে কালো, নয় টকটকে লাল। সঙ্গে জরি আর খাঁটি সিল্কের ডিজাইন। আঁচলাও হত দেখার মতন।

গিরিশ পালের জরি দিয়ে বোনা কলাবতী। তার দাম সেকালেই ছিল পাঁচশো টাকা। আর মুগা দিয়ে নকশা করতেন কিশোরী প্রামাণিক। সেকালের সে-সব শাড়ির বাজার ছিল দিল্লী, কাবুল, ইরান, আরব, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালি।

শান্তিপুরে শিল্পের বড়াই এখন কেউ বড় একটা করে না। আদত কথা, লোকে মনে করে তাঁত থাকলে ভাত। তাও তো পুরো-পেট হয় না।

কলেজের সামনা-সামনি সরু একটা রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তায় হাতে-চালানো তাঁতের উন্নয়ন প্রকল্পের এক সরকারী দফতর। সেখানে বয়নবিদ্যা শেখানোরও ব্যবস্থা আছে।

বসে থাকতে থাকতেই একজনের সঙ্গে আলাপ হল। নিজে কারিগর এবং বেশ কিছু তাঁতের মালিক। বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলায়। তাঁতে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে বাজার বাড়াবার দিকে তাঁর খুব চেষ্টা আছে। তাঁকে ডিজাইন দেওয়া হয়েছিল, সেইমত কিছু নমুনা বুনে এনে সনাতন মল্লিককে দেখাচ্ছিলেন। ধুতি-শাড়ি নয়, জামার কাপড়। দেখে মনে হল, বাজারে ফেললে হু হু করে চলবে।

বললেন, মুশকিল বাধছে সুতো নিয়ে। সুতোর দাম দিনকে দিন চড়ছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে সুতোর দাম হয়েছে ডবল। ২০ কাউন্ট ছিল পঞ্চাশ, হয়েছে নব্বই-পঁচানব্বই টাকা ৪০ কাউন্ট ছিল সত্তর-আশী, হয়েছে একশো পনেরো থেকে একশো পঁয়ত্রিশ। ৬০ ছিল আশী থেকে একশো টাকা, এখন হয়েছে দেড়শো থেকে পৌনে দুশো। দুই বাই চল্লিশ পাড়ের সুতো পঁচাত্তর টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে সোয়া-শো টাকা। সেই সঙ্গে সুতো রং করার চার্জ এক বছরে দশ টাকা বেড়ে গেছে।

তাঁতের সরঞ্জামের দামও বেড়েছে। মাকু চার-পাঁচ টাকা থেকে

বেড়ে ন-দশ টাকা হয়েছে। বয়া ছিল প'য়ত্রিশ থেকে চল্লিশ, এখন হয়েছে পঞ্চাশ। সানা পনেরো থেকে বেড়ে হয়েছে সাতাশ টাকা।

সুতোর ক্ষেত্রে আরেক ভজোকটো। কোনোটা কিনতে হয় কেজির মাপে কোনোটা পাউণ্ডে।

সরকারী চাকুরে হয়েও সনাতনবাবুর তাঁতের নেশা। তাঁর ধারণা, এ দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। তাঁতের ওপর এই টান তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। টেক্সটাইল পড়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল জাপানে গিয়ে এ বিষয়ে অনেক কিছু শিখে আসার। যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আর হয় নি। তাঁত নিয়ে নানা ব্যাবসা ফাঁদার কথাও ভেবেছিলেন; পুঁজির অভাবে হয় নি। ফলে শেষ পর্যন্ত চাকরিতেই ঢুকতে হল। একবার তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছিলেন, এ রাজ্যে যত টিকিন আর রুমাল বিক্রি হয়, সব আসে বাইরে থেকে। একজনকে দিয়ে তিনি কারখানা করালেন। খুব ভাল চলছিল; কিন্তু যেই সে ভাল চাকরি পেয়ে গেল, অমনি কারখানা উঠিয়ে দিল।

এর পর তিনি তৈরি করালেন কাঠের হ্যাণ্ডেল দেওয়া ঝোলা। বাজারে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি। কিন্তু তাঁর দেখাদেখি অন্য লোকে মোটা পুঁজি নিয়ে নেমে পড়ায় বাজার থেকে উনি হটে গেলেন। ভেতরে রবার দেওয়া মোজা বানাবার বুদ্ধি দিলেন যাকে, সে তাঁকে ল্যাং মেরে এখন বিরাট কারবার ফেঁদে বসেছে।

সনাতনবাবুর মাথায় এখনও নানা আইডিয়া গিজ গিজ করছে। যে কেউ একটু উদ্যোগ নিলেই করতে পারে। ওঁর ইচ্ছে রিটায়ার করার পর এ-সব কাজে নিজেই হাত দেবেন।

অথ বাঘ-ছাগল কথা

কৃষ্ণনগর থেকে বাসে চলেছি নবদ্বীপ।

সনাতনবাবুর কথা মনে হচ্ছিল। সত্যি অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু শুধু ছাপ-মারা পণ্ডিতদের দিয়ে এ কাজ হবে না। যাঁদের নামডাক নেই এমন অনেক গুণী মানুষ আছেন, অনেক কিছুতে তাঁদের মাথা খেলে। অনেক কিছু তাঁরা উদ্ভাবনও করেন। কিন্তু অচেনা-অজানা সহায়-সম্বলহীন বলে জ্ঞানীগুণীদের আসরে তাঁরা ঠাই পান না। কাজে লাগার মতন তাঁদের উদ্ভাবনগুলো লোকচক্ষুর গোচরে আনার জন্যে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর কোনো সরকারী বা বারোয়ারী ব্যবস্থা করা যায় না কি? নিদেনপক্ষে কাগজেও তো এ নিয়ে নিয়মিতভাবে লেখা হতে পারে?

স্বরূপগঞ্জে নেমে দেখি পাড় উপচে প'ড়ে গঙ্গার জল রাস্তায় এসে ঠেকেছে। ওদিকে জলঙ্গীও কানায় কানায়।

ফেরি-নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে নবদ্বীপে কাপড়ের হাট দেখে এলাম। আসাম, ওড়িশা, বড়বাজার, আসানসোল, শিলিগুড়ি থেকে কাপড় কিনতে মহাজনেরা আসে। সেই সঙ্গে বিক্রি হয় সাদা কিংবা রঙিন সুতো। তাছাড়া তাঁতের নানা সরঞ্জাম। চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, হোটেলগুলোরও সপ্তাহের এই দিনে মরশুম। বাইরের লোকে রথ দেখা আর কলা বেচার মতন তীর্থদর্শনটাও এই সঙ্গে সেরে নেয়। তাছাড়া নৌকোয় দু পা গেলেই মায়াপুর।

শুক্রবার শুক্রবার এখানে তাঁতীদের হাট বসছে হালে। এ হাট আগে ছিল না।

এপারে ফিরে চরব্রহ্মনগরে মানিক গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ হল। এদিককার খবরাখবর তাঁর কাছ থেকেই শুনলাম।

আগে এ অঞ্চলে তাঁতী-সমাজ বলে কিছু ছিল না। সবাই এসেছে দেশ ভাগ হওয়ার পর। বেশির ভাগ এসেছে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ আর কিছু বরিশাল থেকে। কয়েক ঘর আছে খুলনার। সবাই এক সঙ্গে এক বারে আসে নি। এসেছে অনেকদিন ধরে এবং খেপে খেপে।

নবদ্বীপের সঙ্গে পূর্ব বাংলার লোকদের বরাবরই একটা আসা-যাওয়ার সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া শান্তিপুর বেশি দূরে নয় কাজেই এ অঞ্চলে পূর্ব বাংলার তাঁতীরা এসে ভিড় করেছিল।

শান্তিপুরের তাঁতীদের সঙ্গে এদের মানসিকতার তফাৎ আছে। এরা সহজে হাল ছাড়ে না। যা চায় তা পাওয়ার জন্যে জান কবুল করে।

মিহি কাপড় তৈরির দিকে এরা যায় নি। তিরিশ থেকে ষাট কাউণ্টের সুতোয় এরা তৈরি করে মোটা শাড়ি। কিছু কিছু গামছা-লুঙ্গিও তৈরি হয়। এরা মাকু-টানা দোক্তি তাঁতের বদলে আধা-স্বয়ংক্রিয় চিত্তরঞ্জন তাঁতে কাজ করে। এতে দিনে তিনখানা থেকে পাঁচখানা কাপড বোনা যায়।

এদের কাপড়ের দাম হয় বিশ থেকে চল্লিশ টাকা জোড়া। কেনে গাঁয়ের চাষী, খনি চা-বাগান কলের মজুর আর গ্রাম-শহরের ছাঁ-পোষা পরিবার। ফড়িয়ারা তো নেয়ই, আবার অনেকে ফেরি করেও নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে ঘুরে দোকানে দোকানে দিয়ে আসে।

মানিকবাবু বললেন, এ তল্লাটে আছে হাজার পঞ্চাশেক তাঁত। পুরোপুরি বা অংশত তাঁতের ওপর নির্ভর করে এমন লোকের সংখ্যা

হবে লাখ দুই। একদল সুতো রং করে। তাঁত তৈরির ব্যাপারে কাঠের কাজ করে ছুতোর আর লোহার কাজ করে কামার। আলাদা কিছু লোক মাকু তৈরি করে। রং করার পরও সুতোয় মাড় দিতে হয়, চরকায় গোটাতে হয়। কাজেই তাঁতের সঙ্গে কম লোক জড়িয়ে নেই। ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, গরিব চাষী, কপালী, মুসলমান চাষী— সবাই এর দৌলতে কিছু না কিছু কাজ পায়।

এখন একটা তাঁত কিনতে সাতশো থেকে হাজার টাকা লাগে। তাছাড়া সানা, ববিন, ব' কেনারও খরচ আছে। আগে সানা হত কাঠ কিংবা বাঁশের। এখন হয় লোহার।

এক চরব্রহ্মনগরেই দেখলাম একেকটা শেডের মধ্যে সার-সার চিত্তরঞ্জন তাঁত বসিয়ে বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টরী চলছে। মালিকেরা সবাই এককালে নিজেরা তাঁতী ছিলেন। নিজেদের তাঁত খুইয়ে বা তাঁতের অভাবে এখানে অনেকেই এখন পরের তাঁতে রোজ হিসেবে, নয় ফুরোনে মজুর খাটছে।

সরকার সুতোর দাম বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু বাজারদরের সঙ্গে বাঁধা দামের কোনো মিল নেই। যার দাম হওয়া উচিত সত্তর-আশী টাকা, তার দাম বাঁধা হয়েছে একশো চল্লিশ টাকায়। তার ফলে, বাজারে সেই সুতো বিকোচ্ছে কখনও ছাপা দামের চেয়ে বিশ টাকা কমে কিংবা দশ-বিশ টাকা বেশিতে।

কারো কারো ধারণা, কালো হাতে প্রচুর সুতো বর্ডারের ওপারে চলে যাচ্ছে।

ফেরার পথে গেলাম ফুলিয়ায়।

এখনকার যে ফুলিয়া, তার পত্তন হয়েছে রেল-লাইন আর বাস-রাস্তার ধার বরাবর। আদত ফুলিয়া ছিল আরও পশ্চিমে। অর্ধ-সহস্রাধিক বছর আগে যেখানে থাকতেন কবি কৃত্তিবাস। তাঁর ভিটের পাশেই ছিল গঙ্গা। সেই গঙ্গা কালে কালে অনেক পশ্চিমে

সরে গিয়ে কত যে গ্রামজনপদ গ্রাস করেছে তার ইয়ত্তা নেই। পদ্মা যেখানে ভাঙে, গঙ্গা সেখানে সরে। ভাঙা আর সরার মধ্যে হরেদরে তফাৎ খুব বেশি নয়।

এখন আবার গঙ্গা পুবদিকে পাশ ফিরছে। নিজের চোখে তার চিহ্ন দেখে এলাম। নদীর ধার বরাবর যে পাকা রাস্তা ছিল, তার বিরাট একটা অংশ এখন গঙ্গার গর্ভে। রোজই জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে চাষীদের ফসলসুদ্ধ জমি। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে মানুষের এখন আতঙ্ক।

কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছে, সে সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। প্রাণের টান না থাকলে দায়সারা ভাব যাবে না। জাতীয় আত্মবিস্মৃতির হাত থেকে রেহাই পেলে দেশ গড়ারও আমরা প্রেরণা পাব— আমাদের সরকার কবে তা বুঝবে?

ফুলিয়ায় যে আড়াই হাজার ঘর তাঁতীর বাস, তার মধ্যে প্রায় বারো আনাই টাঙ্গাইলের লোক। তাঁত আছে প্রায় সাড়ে চার হাজার।

যাঁরা টাঙ্গাইলের শাড়ি বোনেন, তাঁরা সকলেই কাজ করেন একশো কাউণ্টের সুতোয়। এঁদের আছে ছ'টি সমবায়। একটি সমবায়ের কাজ হয় চিত্তরঞ্জন তাঁতে। চল্লিশ থেকে ষাট কাউণ্টের সুতোয়।

এখানে এমন মহাজনও পাওয়া যাবে, যার একারই আছে দুশো তাঁত। কিন্তু কে যে মহাজন সেটা বাইরের লোকের পক্ষে সাব্যস্ত করা সহজ নয়। কেননা মালিকের এমনভাবে শেখানো থাকে যে, পরের তাঁতে কাজ করলেও অনেকে চেপে গিয়ে তাঁতটা নিজের বলে চালাবে। পরের তাঁতে যারা কাজ করে তারা দিনে চোদ্দ-পনেরো টাকা মজুরি পায়।

কথা হচ্ছিল ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প সমিতির আপিসঘরে বসে। পাশেই টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমিতি। দুটোই সমবায় হিসেবে বিধিবদ্ধ হতে চলেছে।

ওঁরা ওঁদের সমস্যার কথা বললেন। ওঁদের একশো কাউণ্টের সুতো তৈরি করে কোঠারি, সুপারস্পিনিং আর লক্ষ্মী—দক্ষিণ ভারতের এই তিনটে মিল। সরাসরি মিল থেকে ওঁরা পান না। বড়বাজারে মহাজনদের কাছ থেকে কিনতে হয়। তিন মাস আগে কোঠারির যে দশ পাউণ্ড সুতোর দাম ছিল দুশো সত্তর টাকা, এখন তার দাম হয়েছে তিনশো পাঁচ থেকে দশ। অজুহাত দেয় আসামে বন্যা হয়েছে। অথচ সুতো আসে দক্ষিণ ভারত থেকে।

সুপারস্পিনিঙের সুতো পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষ্মীর সুতো পাওয়া গেলেও খুব পছন্দসই নয়। তিন মাস আগে তার দাম ছিল দুশো ষাট, এখন হয়েছে প্রায় তিনশো। জরি আসে সুরাট থেকে। তার দামও বাণ্ডিলপ্রতি দু-তিন টাকা বেড়েছে। আর্ট সিল্কের দাম কেজিতে আট দশ টাকা বেড়েছে। আসাম থেকে প্রয়োজনমত মুগা আসে না দামও বেড়েছে কেজিতে পঞ্চাশ টাকা।

এদিকে তৈরি শাড়ির দাম পড়ে গেছে। গত বছরে যা ছিল তার চেয়ে আট-দশ টাকা কম। বড়বাজারের পাইকাররাই একমাত্র ভরসা। বাজারের কোন স্থিরতা নেই।

আবার ওদিকে বড়বাজারের একদল মহাজন কম মজুরিতে নকল টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করিয়ে টাঙ্গাইলের দামে বেচছে। এর সঙ্গে শান্তিপুরের কিছু মহাজনের আছে যোগসাজস।

কলকাতায় ফিরে এসে তাঁতশিল্প সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী দেশাইর বক্তৃতা পড়ে চোখ কপালে উঠল। কাপড়ের মিলের হাত থেকে তাঁতশিল্পকে চিরদিন বাঁচিয়ে চলা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁতশিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

এ যেন ছাগলকে বলা—ওহে, চটপট গায়ে জোর করে নাও, লড়তে হবে—বাঘকে তো আর বেশিদিন বেঁধে রাখা যায় না।

মরা ডালে ফুল

কুষ্ঠরোগের কিভাবে চিকিৎসা হয় দেখার জন্যে একদিন গৌরীপুরে আমাকে যেতেই হল। বাঁকুড়া থেকে খাতনার প্রাইভেট বাস।

তিন কোয়ার্টার আগে যাওয়ার ফলে বসবার একটা সিটও পেয়ে গেলাম। আমার ঠিক পাশেই বসেছিলেন একজন কমবয়সী মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ; উনি গৌরীপুরে নামবেন। স্টেটবাসও যায়।

তবে স্টেটবাস গৌরীপুরে থামে না। পাছে কুষ্ঠরোগীরা বাসে ভিড় করে সেই ভয়ে। এটা আমাকে বলেছিলেন গৌরীপুরের একজন সমাজকর্মী। হাসপাতালের গায়ের ওপর দিয়ে গেছে রেললাইন; সেখানে অনায়াসে একটা হল্ট স্টেশন হতে পারত। তাতে শুধু রোগী নয়, কর্মীদেরও আসা যাওয়ার দুর্গতি কমত। কিন্তু এ নিয়ে কেই বা বলে আর কেই বা দেখে।

মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, গ্রামাঞ্চলে যা পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই জাল ওষুধ। পাশ-করা ডাক্তার খুব কম। অধিকাংশই রেজিস্ট্রেশন পাওয়া বা না-পাওয়া হাতুড়ে ডাক্তার। কারো কারো এত পশার যে, দিনে তাঁরা একশো দেড়শো রোগী দেখেন। সার্জারি বাদে আর সব কেস্ই তাঁরা হাতে নেন। পশার যখন আছে, তখন কিছু কিছু সারে নিশ্চয়।

হাসপাতালে ঢোকার মুখে জিগ্যেস করেছিলাম, গৌরীপুরে বেড কত? তিরিশ। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম আসল সংখ্যা এর প্রায় আঠারো গুণ। শিগগির শতকরা দশটি বেড বাড়বে। তার মানে,

গৌরীপুরে যাতায়াত করলেও ঠিক কত বেড আছে এ খবরটা কখনও তিনি জানবার চেষ্টা করেন নি। তিনি সেখানে যান নিশ্চয় ভয়ে ভয়ে। কাজ সেরে কোনোরকমে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচেন। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা তো আমাদের সকলেরই।

সমস্যা ডাক্তারদের নিয়েও। এখানে বদলি করলে অনেকেই আসতে চান না। এখানে আছেন শুনে কলকাতার ডাক্তারবন্ধুরা কেউ চোখ কপালে তোলেন, কেউ আঁতকে ওঠেন। যদি ওঝাদেরই ভুতে ধরে তাহলে তো হয় শিরে সর্পদংশনের অবস্থা।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ সত্য সরকার এখানে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। পাঁচশো তিরিশ বিঘার ওপর ছড়ানো হাসপাতাল দেখাতে দেখাতে তিনি এক সময়ে হেসে বললেন—দেখুন, আমি কেমন যেন এটাকে ভালবেসে ফেলেছি। এখন এটাই আমার ধ্যানজ্ঞান। আমার মটো হল, চিকিৎসা হবে এমন—যাতে একজনও বিকলাঙ্গ না হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় এলে ছ' মাসের মধ্যে সেরে যায়। নইলে এক থেকে তিন বছর লাগে। অনেকে চেষ্টা করে থেকে যেতে। ওষুধপত্তর খায় না। রোগ পুষে রাখতে চায়। সবচেয়ে বেশি মুশকিল মেয়েদের। স্বামীরা ভর্তি করে দিয়ে চলে যায়। ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে করে। স্ত্রী সেরে গেলেও আর নিতে আসে না। এখানে থেকে মনে হয়, কুষ্ঠ হলে মানুষের সব সম্পর্কই এক ফুঁয়ে শেষ হয়ে যায়। সেরে গেলে চাকরিতে ফিরিয়ে নেয় না। নিলে অচ্ছুৎ করে রাখে।

গৌরীপুর থেকে ভালো হয়ে একজন বোম্বাই গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। সহকর্মীরা জানতে পেরে নালিশ করে। তার চাকরি যায়। তখন ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া তার আর উপায় রইল না। কিন্তু লোকে বলতে লাগল—সুস্থ শরীরে খেটে খেতে পারো না? তখন সে হাতে-পায়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে ঘা বানাল।

ব্যস, তারপর আর দেখতে হল না। পুণ্যলোভাতুরদের পয়সায় তার ভিক্ষের ভাঁড় উপচে পড়ল।

খেজুরডাঙায় শেষ পর্যন্ত সরকারী টাকায় তৈরি হল রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর নাম দিয়ে আরোগ্যাবাস। পুরো ডাঙা জমিটাই এখন আরোগ্যাবাসের। সুকুমারবাবু এর অধীক্ষক। খেজুরডাঙা বললে লোকে এখন চিনবে না।

গৌরীপুর হাসপাতালে রুগীদের কোনো চিকিৎসার খরচ নেই। সরকারী টাকায় মাথা পিছু আড়াই টাকায় দিনে তিন বেলার খাবার বরাদ্দ। বাজার আগুন, কিন্তু আজও সেই পুরনো রেট। সরকারের এই এক দোষ। ভেতর ফোঁপরা, অথচ ঠাট ঠিক বজায় থাকবে। ফলে, এক সময় হাসপাতালে সবজি চাষ করা হত। চুরিচামারির ঠেলায় এখন তাও বন্ধ।

খেজুরডাঙার আগের চেহারা কেউ যদি দেখতে চায়, হাসপাতালের সঙ্গে লাগাও পেছনের গ্রামটাতে গেলেই সে তা দেখতে পাবে। গ্রামের নাম কল্যাণপুর। হাসপাতাল থেকে ছাড়া-পাওয়া কুষ্ঠরোগীদের কলোনি। সবরকম সমাজবিরোধী কাজের ডিপো।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অম্বর বাউড়ি। হাসপাতালে পেশেণ্ট ছিল। সেরে উঠে এখানেই কাজ নিয়েছে। ডাঃ সরকার জিগ্যেস করলেন, সকালে শাঁখ বাজছিল—কী ব্যাপার? অম্বদ বলল, কল্যাণপুরে আজ একটা বিয়ে ছিল।

ভূতপূর্ব রোগী রোগিণীর বিয়ে এখানে লেগেই আছে।

ডাক্তারবাবু এক চাষী বউয়ের গল্প বললেন। সে এখানে পেশেণ্ট হয়ে অনেকদিন ছিল। সেরে উঠে ফিরে গিয়ে দেখে বাড়িতে সতীন। তাকে থাকতে হল গোয়ালে। সেই সঙ্গে দুবেলা লাথিঝাঁটা। শেষকালে হাসপাতালে ফিরে এসে নিল ঝাড়ুদারের কাজ। মাস-মাইনে তো আছেই, তার ওপর থাকার কোয়ার্টার। পরে সতীন মারা গেলে স্বামীটি এসে বউয়ের ঘাড়ে ভর করল। এখন তাদের তিন চারটি সন্তান। স্ত্রী খাটে, পতি পরমগুরু বসে খায়।

ডাক্তারবাবু বললেন, কাল আমাদের হাসপাতাল জীবনের এক বিশেষ দিন। কাল থেকে এখানে প্রথম চালু হবে খুব সূক্ষ্ম জটিল এক অস্ত্রোপচার পদ্ধতি। রিপু সেলাইয়ের কায়দায় পেশী আর নার্ভ জোড়া দেওয়া হবে। যাতে হাত পায়ের আঙুলের অসাড়ত্ব দূর হয়। ইলেকট্রিকসিটি এই আছে এই নেই। নিজেদের ডায়নামো না থাকলে যে কী মুশকিল আমরা তা হাড়ে-হাড়ে বুঝি।

উঠতে হল। দেরি করলে শহরে ফেরা দায় হবে। একটা ফিরতি খালি অ্যাম্বুলান্স শহরে যাচ্ছিল। হাসপাতালের একজন সমাজসেবা কর্মী আমাকে ডাকলেন—বাঁকুড়ায় যাবেন তো আমাদের সঙ্গে চলে আসুন। বাসের ভরসায় বসে থাকলে মরবেন।

যেতে যেতে তাঁর কাছে দুঃখের গল্প শুনছিলাম। একদিন তিনি ব্ল্যাকডায়মণ্ডে আসছিলেন। পাশের ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, কোথায় কাজ করেন। যেই বলেছি গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোক যেন শক্ খেয়ে বেশ খানিকটা দূরের একটা সিটে ছিটকে সরে গেলেন। এ থেকেই বুঝবেন বাইরের লোকে আমাদের কী চোখে দেখে। এখানে রোগীদের রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে। কোনো অনুষ্ঠানে বাইরের শিল্পীরা ভয়ে আসতেই চায় না। গান শুনিয়ে, নাটক দেখিয়ে রোগীদের একটু আনন্দ দেবেন তারও উপায় নেই।

সুকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, আজকাল 'লেপার' আর 'লেপ্রসি' কথাগুলো তুলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এ রোগের প্রকৃতি নিরূপণ করেছিলেন হ্যানসেন সাহেব। তাই 'কুষ্ঠ' না বলে অনেক সময় এই রোগকে বলা হয় 'হ্যানসেনের অসুখ।'

হাজার নাম বদলালেও লোকের মনে যে কুষ্ঠ সেই কুষ্ঠই থেকে যাবে। মনের অন্ধকার দূর না করলে লোকের কুসংস্কার যাবে না। তার জন্যে যত রকমে পারা যায় মানুষকে জানাতে হবে। একাজে সাহায্য নিতে হবে বিশেষ ক'রে তাঁদের, ইহকালের জন্যে না হলেও পরকালের জন্যে লোকে যাদের ওপর ভরসা রাখে।

নবজীবনপুর যে রাস্তা নিয়েছে একমাত্র সেই রাস্তাতেই রোগ সারিয়ে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব।

সে হল মরা ডালে ফুল ফোটানোর রাস্তা।

নাম রেখেছি নবজীবনপুর

যাচ্ছিলাম খেজুরডাঙায়। ডাক্তার লালমাধব গাঙ্গুলির গাড়িতে ক'রে। বাঁকুড়া শহর থেকে মাইল তিনেকের পথ। যখন রওনা হলাম তখন ভরসন্ধ্যে।

ডাক্তার গাঙ্গুলি বলছিলেন :

এ সময় খেজুরডাঙার রাস্তায় পা দেবার কথা আগে ভাবা যেত না। ছিনতাইয়ের দল ওৎ পেতে বসে থাকত। উটকো লোক গেলে রে রে করে এসে সর্বস্ব কেড়ে-কুড়ে নিত। খেজুরডাঙার নাম শুনলে লোকে ডরাত।

সকাল হলেই এ গাঁয়ের সবাই বেরিয়ে পড়ত ভিক্ষেয়। শুধু একদল মেয়ে থেকে যেত দিন-রাত চুলো জ্বেলে মদ চোলাই করার কাজে।

দিনের বেলায় খাঁ খাঁ করলেও খেজুরডাঙা গম গম করত সন্ধ্যের পর। শুকনো পাতায় ছাওয়া ঝুপড়িগুলোতেও এসে জুটত শহরের যত মাতাল লম্পট আর ওঁছা মানুষ। রাতের অন্ধকারে হত নরক গুলজার। জলের দরে বিকোত চোলাই মদ আর দাগী মেয়েমানুষ। খেজুরডাঙা ছিল চোরাই মাল রাখা আর ফেরারী লোকদের গা ঢাকা দেবার নিরাপদ জায়গা।

শুধু চোর পুলিশ কেন, বাঁকুড়া শহরের তামাম লোকে জানত এখানে কী হয় না হয়। গায়ে হাত দেওয়া দূরের কথা, এদের ছোঁবার কথাও কেউ ভাবতে পারত না। এরাও বিলক্ষণ জানত যে, খুন করলেও

কেউ এদের ধরতে ছুঁতে পারবে না। পুলিশের হল্লা যদি আসেও, তারা নিজেদের গা বাঁচিয়ে বড় জোর লাঠি দিয়ে হাঁড়িকুড়িগুলো ভেঙে দিয়ে যাবে। বুকের পাটা দেখিয়ে যদি গ্রেপ্তারও করে, কোথাও এদের আটক রাখার জায়গা খুঁজে পাবে না। জেলখানার সেপাই কয়েদী কেউই চাইবে না এদের ছায়া মাড়াতে।

আগে এটা ছিল গোয়ালাদের চাষের অযোগ্য ডাঙা জমি। ডাক্তার ব্রায়ানের কুষ্ঠ হাসপাতাল-এর লাগোয়া। মিশনারিদের হাসপাতাল ব'লে চিকিৎসার সুবন্দোস্ত ছিল।

খেজুরডাঙায় ঝুপড়ি বানিয়ে যারা বাস করতে আরম্ভ করে, তারা সবাই এই হাসপাতালের ছাড়া-পাওয়া রোগী। যারা ডাঙা জমির মালিক ছিল, এদের দিয়ে তারা বাড়িতে বেগার খাটিয়ে নিত। চাষের সময় এরা কাজ করত একজন ক্ষেতমজুরের সিকিভাগ মজুরিতে। ছেলের চেয়ে মেয়েরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। তার একটা বড় অংশ ছিল স্বামী পরিত্যক্ত।

অসুখ সেরে গেলে কী হবে, এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আমাদের সমাজ যে, স্ত্রী-পুরুষেরা কেউই আর তাদের ঘরে ফিরতে পারে নি। সুযোগ-সন্ধানীরা তাদের বিষয়-সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর কিংবা স্বামীকে স্ত্রীর তালাক দিয়ে নতুন করে সংসার পাততে দেরি হয় নি। পিতা-পুত্র ভাই-বোন কোনো সম্পর্কই টেঁকে নি। শুনে মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলার নয়। খেজুরডাঙায় ঢোকার মুখে ডাক্তার গাঙ্গুলি বললেন, এখন কিন্তু এ জায়গার নাম আর খেজুরডাঙা নয়। নাম বদলে হয়েছে নবজীবনপুর।

গ্রামে ইলেকট্রিক না থাকায়, শুধু গাড়ির হেডলাইটের আলোয় আশপাশগুলো চোখে পড়ছিল। ঝুপড়ি কোথায়? দিব্যি নিকোনো মাটির বাড়ি।

যে চত্বরে গাড়ি এসে থামল তার ডানদিকে আর সামনে দুটো

একতলা দালান। আমরা নামতে না নামতে এসে গেল ডে-লাইট বাতি। ডানদিকের একতলা বারান্দায় একদল প্রৌঢ় বসে গল্প করছিলেন। তাঁরা এগিয়ে এলেন। আর ঠিক সেই সময় বাঁদিকে আবছা আলোর ভেতর দিয়ে একজন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ভদ্রলোককে হনহনিয়ে আসতে দেখলাম। ডাক্তার গাঙ্গুলি আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'খেজুরডাঙাকে যিনি নবজীবনপুর বানিয়েছেন, ইনি সেই সুকুমার সেনগুপ্ত।'

সুকুমারবাবু আমাকে অবাক করে দিয়ে হেসে বললেন, 'আমারও কুষ্ঠ হয়েছিল। মুখে এই দেখুন প্লাস্টিক সার্জারির দাগ। আর এই দেখুন চোট খাওয়া হাত। তবে আজকের দিন হলে শরীরে এসব খুঁত থাকত না।'

ডাক্তার গাঙ্গুলি বললেন, 'মিসেস সেনগুপ্তকে দেখুন। ধরতেই পারবেন না।'

আমাকে না বললে, সত্যি, আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, এক সময়ে সুকুমারবাবুর মত শেফালী দেবীও ছিলেন গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালের পেশেণ্ট। তাঁর বাপের বাড়ি কলকাতায় পার্ক সাইড রোডে। আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। এক হিসেবে এঁরা দুজনেই ভাগ্যবান। আপনজনদের কাছে এঁরা আদর-যত্ন পান। কেননা এঁদের দুজনেরই বাপের বাড়ি এ ব্যাপারে একেবারেই কুসংস্কারমুক্ত। সন্তান হওয়ার দিক থেকেও ডাক্তারি মতে এঁদের কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু সমাজে পাছে তাদের তাচ্ছিল্য হয়, সেই ভেবে এঁরা নিজেরাই চান নি।

সুকুমারবাবু বাঁকুড়া শহরের এক বনেদী ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন নামকরা ভালো পশারওয়ালা মোক্তার। কম বয়সে রোগের লক্ষণ যখন ধরা পড়ে, তখনই বাবা হাসপাতালে দিলে ছেলেকে পরে এত ভুগতে হত না। না দেওয়ার পেছনে লোকলজ্জার ভয়ের চেয়েও বেশি ছিল স্নেহের আকর্ষণ। ইস্কুলে না নেওয়ায় ছেলেকে তিনি

বাড়িতে পড়িয়ে জায়গা বদলে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করান। পরে এক সময় সারা শরীরে রোগ যখন ফুটে বার হল, তখনও হাসপাতালে পাঠাতে চান নি। ওষুধ বলতে তখন সালফার আর চালমুগরা।

শেষকালে সুকুমারবাবু নিজে জোর করে গৌরীপুর হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হন। তারপর বাড়ি ফিরলেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে। বাড়িতে তাঁর আদরযত্নের কোনো অভাব হয় নি। কিন্তু কিছুদিন পরই বুঝলেন যে বাইরের লোক বাড়িতে এলে খুব অস্বাস্তিতে পড়ে। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ হলেও তাঁকে কেউ ঠিক স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না।

তিনি ঠিক করেন বাড়ি ছেড়ে আলাদাভাবে থাকবেন। রোগমুক্ত কুষ্ঠরোগীদের জন্যে একটা আরোগ্যাবাস গড়ার স্বপ্ন তখন থেকেই তাঁকে পেয়ে বসে। কুষ্ঠ হলে সমস্যা তো আছেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা দেখা দেয় রোগ সেরে যাওয়ার পরে। গ্রামে ফিরে গেলে সবাই তাকে অচ্ছুৎ করে রাখে। ইঁদারা থেকে জল তুলতে পারে না। রাস্তায় তার ছায়া মাড়াতেও লোকে ভয় পায়। সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করে। সমাজ যাদের নেয় না তারা সমাজবিরোধী হয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। এইসব দেখেশুনে রোগীরা চেষ্টা করে তাদের রোগ পুষে রাখতে—যাতে হাসপাতালে থেকে যেতে পারে।

সন্ধ্যের পর এখন যে কেউ নিরাপদে নবজীবনপুরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। মদ চোলাইয়ের পাট উঠে গেছে। এ গাঁয়ে আগে যারা সন্ধ্যের পর মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত, সন্ধ্যের পর তারা হরিসংকীর্তনে মেতে ওঠে। যাদের খাটবার শক্তি আছে তারা চাষবাস করে, ধান ভানে, সুতো কাটে, কাপড় বোনে। যাদের কম বয়স, তারা নানারকমের হাতের কাজ শেখে। যারা পঙ্গু, তাদের দুবেলা খাওয়ানো হয়।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যে মেয়ে-পুরুষেরা এখানে ঘর বেঁধেছিল, প্রকৃতির নিয়মে তারা জোড়ও বেঁধেছিল। তাদের

সন্তানেরা সবাই সুস্থ নীরোগ। ব্যাপারটাকে আইনসঙ্গত করার জন্যে ক'বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে ডেকে সদলবলে তাদের বিয়ে দেওয়ানো হয়। অনেকেরই তখন ছেলেমেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। ফলে, বিয়ের আসরে দেখা গেল বাপ-বেটা মায়ে-ঝিয়ে একই সঙ্গে বিয়ের মন্ত্র পড়ছে।

ভোটারলিস্টে নাম তোলানোর ফলে শুধু এই জায়গাটুকুতেই এখন সাতশো ভোটার। ভোটপ্রার্থী সব দলই এখন নবজীবনপুরের বাসিন্দাদের রীতিমত খাতির করে চলে। আপনি-আজ্ঞে বলে।

সামনের যে একতলা বাড়িটার হলঘরে দিনের বেলায় ছোটদের ইস্কুল বসে, সেখানে সন্ধ্যেবেলায় লাইনবন্দী পঙ্গুদের খাওয়ানো হচ্ছিল। পায়ে তাদের ফিতে-বাঁধা এক রকমের জুতো। ঘষটানি লেগে অসাড় জায়গাগুলোতে যাতে ঘা না হয়, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। আগে এসবের বালাই ছিল না।

ডাক্তার গাঙ্গুলি বললেন, আমরা চেষ্টা করছি বাচ্চা বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা যাতে বাপ মায়েদের কাছে না থেকে নিজেরা আলাদাভাবে থাকতে পারে। তাহলে সংক্রমণের ভয় আর থাকবে না। আস্তে আস্তে পুরোপুরি কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়ে নবজীবনপুর হবে অন্য যে কোনো জায়গার মতই চাষীদের গ্রাম। কেউ তখন মনমরা থাকবে না। ছেলে-মেয়েদের মুখে হাসি ফুটবে। আজ সেই ভবিষ্যতের ভিত গড়া হচ্ছে।

দুই বগলে ক্রাচে ভর দিয়ে ভাঙা শরীর নিয়ে যিনি উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নামও সুকুমার। অসুখ হওয়ার আগে তিনি ছিলেন এক গ্রামের প্রাইমারি শিক্ষক। খেজুরডাঙার পূর্ব জীবনের তিনিও ছিলেন শরিক। জীবনের ধারা আজ একেবারে বদলে গেছে।

'এই হল এঁর ছেলে শ্যামল'—বলে যাকে আমার সামনে এনে

দাঁড় করানো হল তাকে দেখে কে বলবে তার মা-বাবা, দু-জনেই কুষ্ঠরোগে বিকলাঙ্গ ? বছর বাইশ তেইশের এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান শ্যামল। আরোগ্যাবাসের ডিস্পেন্সারির ভার তার ওপর।

সুকুমার সেনগুপ্ত বললেন, 'এসব কাজে কর্মীর বড় অভাব। এর একটা বড় কারণ, কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে অহেতুক ভয়। বিদেশী মিশনারিরা তো কই ভয় পান না ? কিন্তু মুখে যাঁরা দেশোদ্ধার বা নরনারায়ণের সেবার কথা বলেন, তাঁরা কেন এ কাজে এগিয়ে আসেন না ?'

সত্যি বলতে কি, নবজীবনপুরে না গেলে আমার নিজেরও কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত ভুল ধারণাগুলো ভাঙত না। খুব কম সাপ যেমন মারাত্মক রকমের বিষধর, তেমনি খুব কম ক্ষেত্রেই কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে। সংক্রামক রোগীকে একদিন হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললেই যে কুষ্ঠ হবে এমন নয়। ক্রমান্বয়ে দীর্ঘদিনের সংস্পর্শ ছাড়া হয় না। হওয়া না হওয়া নির্ভর করে প্রতিরোধের ক্ষমতার ওপর।

সুকুমারবাবু বললেন, 'ছেলেবেলাতেই এ রোগের বীজ শরীরে ঢোকে। তারপর হয়ত অনেক বেশি বয়সে তা ফুটে বেরোয়। যেমন ধরুন আমি। ছেলেবেলায় ভালো দেখতে ছিলাম বলে আমার নাম হয়েছিল সুকুমার। বাচ্চা বয়সে আমাকে যারা চটকাত, তাদের মধ্যে কেউ হয়ত সকলের অজান্তে ছিল সংক্রামক কুষ্ঠরোগী। কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তদের মধ্যে যাদের দেখতে বীভৎস, আসলে তারা মোটেই ভয়ের নয়। বাইরে থেকে যাদের দেখে বোঝার উপায় নেই, তারাই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক।'

নবজীবনপুরে গোড়ায় যখন পা দিয়েছিলাম তখন বেশ একটু গা ছমছম করছিল বৈকি। কিন্তু ভয় ভাঙতে দেরি হয় নি। বরং বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটা মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি।

পৌষ পেরিয়ে

এবারের ঘোরাঘুরিতে যে নিজের অজ্ঞান্তে পৌষ মাস বেছে নিয়েছিলাম, সেটা হুঁশ হল জয়দেবের মেলা দেখতে বেরিয়ে।

মেলা বসে পৌষ সংক্রান্তিতে। তার মানে, বছরের সবচেয়ে সুসময়ে আমি এতদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। দুঃখের যে ছবিগুলো দেখেছি এরপর কি তাতে আরও চড়া রং লাগবে?

তাহলে তো ভয়েরই কথা। আবার ভরসার ব্যাপারও আছে। যেভাবে খোদার ওপর খোদকারি করে চলেছে বিজ্ঞান, তাতে পুরনো অনেক প্রবাদই বরবাদ হয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করলাম মেলার প্রথম দিনটা এড়ানো ভালো। কেননা বিস্তর চেনা লোকজন আসবে। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই গল্পগুজবে ফেঁসে যাব।

কাজেই বোলপুরে নেমে রাত্তিরে থেকে গেলাম লামাজীদের বাড়ি। পুরো নাম চিম্পা লামা। তিব্বতীর অধ্যাপক। ও-বাড়িতে আমরা প্রায় ঘরের লোক। আগে থেকে বলা-কওয়ারও কোনো দরকার হয় না।

রাস্তায় আলো না থাকায় বাড়িটা ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ক'রে অমর ব'লে ডাকতেই লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল লামাজীর ছেলে। এখন মাথায় বেশ বড় হয়েছে। ইস্কুলের পড়া শেষ করে চীনা ভাষা পড়ছে। অমরের মা খু-শি সিকিমের মেয়ে। গ্যাংটকে মানুষ। ছোট্ট ওয়াং-চি তার

ভাইয়ের মেয়ে। বাড়িতে তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, সিকিমী, বাংলা, হিন্দী সব ভাষাতেই কথা হয়। লামাজী এ ছাড়াও বলতে পারেন চীনা আর ইংরিজি। প্রত্যেকেই সুন্দর বাংলা বলে। খু-শি রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভাল গায়, ছবিও আঁকে। অমর বাংলায় ভাল অভিনয় করে।

রাত্তিরে লামাজীকে ধরে বললাম। ছেলেবেলা কিভাবে কেটেছে, কেমন করে এদেশে এলেন, তার গল্প বলুন।

লামাজী বললেন আগাগোড়া বাংলায়।

মঙ্গোলিয়ার যে অংশটা চীনের অন্দরে, লামাজী সেখানকার মানুষ। আজকের সঙ্গে সেদিনকার মঙ্গোলিয়ার ছিল অনেক তফাৎ। লোকে থাকত তাঁবুতে। লামাজীর তাঁবুতেই জন্ম। তাঁবু বলতে কাপড়ের টেণ্ট নয়। কাঠের মোড়ানো তাঁবু। মঙ্গোলীয় ভাষায় তাঁবুকে বলে 'ইউর্তা'। বহির্মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে দেখেছি। এমনভাবে বানানো যাতে শীত আটকায়। সেদেশে তো ভীষণ ঠাণ্ডা। বরফে চারদিক এমন ঢেকে যেত যে দরজা খোলা দায় হয়ে পড়ত। দরজা কোনোরকমে খুলে কোদাল দিয়ে রাস্তা করতে হত। বরফের ঘর করে তার ভেতর লোকে শীতের ক'মাসের খাবার জমিয়ে রাখত। দুধ মাখন মাংস। একটা পাত্রে দুধ নিয়ে বাইরে দশ মিনিট রাখলেই দুধ জমে যেত। এইভাবে জমিয়ে জমিয়ে রেখে তারপর খাওয়ার সময় আগুনের আঁচে গলিয়ে নেওয়া হত। শীতকালে কোথাও জল দেখতে পাওয়া যেত না। শুধু বরফ। স্নান করার কথাই উঠত না। মাঝে মাঝে শুধু গরম জলে একটু গা মুছে নেওয়া।

গরমে থাকার পাকা বাড়ি ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই থাকত তালাবন্ধ। লোকে ভেড়া ছাগল উট নিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যেখানে ভাল ঘাস পাওয়া যেত সেখানেই ডেরা ফেলত।

একমাত্র মঠগুলোই ছিল স্থায়ী আস্তানা। গ্রামে ইস্কুল বলে কিছু ছিল না। ছেলেদের পড়াবার জন্যে হয় মঠে পাঠাতে হত, নয় বাড়িতে গুরু রাখা হত। লামাজীর হাতেখড়ি হয়েছিল পাশের বাড়ির এক গুরুর কাছে। তিব্বতী ভাষায়। সেইসঙ্গে ক্রমে মঙ্গোলীয় সাহিত্যের ভাষাও রপ্ত করলেন। খানিকটা এইভাবে তালিম হওয়ার পর তাঁকে মঠে পাঠানো হল। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে পড়তে হত।

দেড় বছরে লেখাপড়া বেশ খানিকটা এগোবার পর চীনের এক বৌদ্ধ মঠে তাঁকে দু বছরের জন্যে পড়তে পাঠানো হল। সেখানে মূল বই, ভাষা, ব্যাকরণ এসব শেখার খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল না। শুধু পাঠ আর পুজো। বাস, তার বেশি বিশেষ কিছু নয়।

লড়াই তখন শেষ হয়েছে। জাপানীরা চীন ছেড়ে পালাচ্ছে। লামাজীর বয়স তখন বছর উনিশ। সেই সময় তাঁদের কয়েকজনকে বাছাই করে পাঠানো হল লাসায়। তিব্বতী মঠে এসে এতদিনে পেলেন পুরোদস্তুর শিক্ষা। ছ বছর পর যখন তাঁর দেশে ফেরার পালা এল, তখন চীনে বড় রকমের ওলটপালট হয়ে গেছে। যে এলাকায় ওঁদের বাড়ি, সেখানকার মঠে পুরনো লোকজনেরা আর নেই। এদিকে না আসে বৃত্তির টাকাপয়সা, না পাওয়া যায় চিঠি লিখে কোনো উত্তর। লামাজী তখন ঠিক করলেন সটান হাঁটাপথে ভারতে আসবেন।

চুম্বী উপত্যকা পৌঁছুতে লাগল দিন পনেরো। একনাগাড়ে হাঁটা নয়। কিছুটা পথ যাওয়ার পর কোনো মঠে কিংবা কারো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া। দুতিন দিন থেকে যাওয়া। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বর্ডার। সেখানে পাওয়া গেল ভারতে ঢোকার পারমিট। সঙ্গে পয়সাকড়িও বেশি নেই। চেনাজানাও কেউ নেই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আলাপ হয়ে গেল তিব্বতী আর মঙ্গোলীয় ভাষায়

সুপণ্ডিত রোয়েরিকের সঙ্গে। তারপর এ-কাজ সে-কাজ করে এখন এই শান্তিনিকেতনে।

বললেন, 'অবসর নেবার পর চলে যাব ঠাণ্ডা কোনো জায়গায়। কোনো রকমে দিন চলে গেলেই হল। ঘরবাড়ি জমিজমা এসবের কোনো লোভ আমার নেই।

'দেশের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। যেমন একটা বড় পাথর। তার ওপর বসে খেলতাম ছোটবেলায়। সেইটা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। চারিদিকে সেই পাহাড় পর্বত, সেই নদী, সেইসব ঝাউ। ছবির মতন ভেসে ওঠে। ইচ্ছে করে এখুনি ছুটে যাই। কম বয়সে মনে হত না। এখন ভীষণ মনে পড়ে। ভাবি, কোনো সময়ে চীনের সঙ্গে যদি আবার এদেশের সম্পর্ক ভাল হয়, যাওয়া আসার বাধা উঠে যায়— একবার গিয়ে দেখে আসব ছেলেবেলার সেইসব জায়গা।

'বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। ঠাকুরদা আর মা বেঁচে ছিলেন। আমরা ছিলাম এগারো জন ভাইবোন। তার মধ্যে পাঁচ জন বসন্ত রোগে মারা যায়। আমাদের দেশে টিকা দেবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা ছিল। একটা গুঁড়ো মতন ওষুধ নলে ক'রে নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তারপর সারা গায়ে বার হত বসন্ত রোগের সাংঘাতিক গুটি। অনেকের গায়ে সারা জীবনের মত দাগ থেকে যেত। টিকেটা ছিল ভারি কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার। আট-ন বছর বয়স না হলে সেটা দেওয়া যেত না। সেই বয়সে পৌঁছুবার আগেই আমার ভাইবোনেরা মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদের আর কোনো খবর পাই নি। মার কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট হয়।

'মঙ্গোলিয়া থেকে চীন, চীন থেকে তিব্বত সবই গিয়েছি হাঁটা পথে। সীমান্ত পার হওয়া ছিল বেশ শক্ত কাজ। চীন থেকে তিব্বত গিয়েছিল্যাম জঙ্গলের রাস্তায়। সঙ্গে ছিল উট। দিনের বেলায় উট নিয়ে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুমোতাম। সন্ধ্যের পর শুরু

হত আমাদের চলা। সঙ্গে খাবার থাকত—ছাতু, মাখন আর শুক্‌নো ছানা। খাবার ফুরিয়ে গেলে গেরস্থদের বাড়িতে গিয়ে হাত পাততাম। কেউ কেউ দিত, আবার কেউ কেউ হাঁকিয়েও দিত। কতদিন খালি পেটে থাকতে হয়েছে। শরীরটা খুব হালকা লাগত। চলতে কোনো ক্লান্তি হত না। এইভাবে চীন থেকে তিব্বত পৌঁছুতে তিন মাস লেগেছিল।

'আমি মঙ্গোলিয়ার লোক। তিব্বতের ঠাণ্ডা আমার ঠাণ্ডা বলেই মনে হত না। মাঝে মাঝে খুব বেশি হলে পুকুরের জলে কাগজের মত একটা পর্দা পড়ত। মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে সেই ঠাণ্ডার কোনো তুলনাই হয় না।'

সকালে উঠে লামাজীকে বললাম, চলুন না জয়দেব দেখে আসি। লম্বা রাস্তা পাড়ি দেওয়া লামাজী এখন একেবারেই ঘরকুণো। কাজ না থাকলে বড় একটা বেরোতেই চান না।

খু-শি এক পায়ে রাজী। সকালের বাসে রওনা হলাম কেঁদুলি।

এবার মেলা দেখতে যাচ্ছি বহু বছর পর। সে সময় এত বাস ছিল না। যাত্রীও ছিল কম। এখন লাইনের বাস ছাড়াও, লগনসার অনেক বাস।

জয়দেবে ঢোকার রাস্তাটা এখন পাকা হয়ে গেছে। ফলে, আগের মতন এতটা ধুলো ওড়ে না। খানিকটা পথ আগে বাস গেল বিগড়ে। সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে এসেছি। কাজেই একটু বসে জিরিয়ে নেবার জন্যে বাইরে এলাম। এসে দেখি বাসের ভেতরে যত লোক তার সমানসংখ্যক ছাদের মাথায়। বেশির ভাগই এসেছে বাইরে থেকে ট্রেনে।

শেষ যেবার এসেছিলাম সেবার এক গাড়ির দুর্ঘটনায় শেষ অবধি আর মেলা দেখা হয় নি। তখন ছিল কাঁচা রাস্তা। গাঁয়ের এক রাখাল ছেলেকে কোলে নিয়ে দুর্গানাম জপতে জপতে সিউড়ির

হাসপাতালে ছুটতে হয়েছিল। সেদিনকার কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

এবার মেলার চেহারা দেখে মনে হল অনেক বদলেছে। এখন আর সেই ছড়ানো ছিটানো ভাব নেই। সার সার লাইনবন্দী দোকান। ইলেকট্রিক আসায় মাইকে মাইকে ছয়লাপ।

জয়দেব মোহান্ত এস্টেটের ম্যানেজার অতুল দত্ত এই অঞ্চলেরই লোক। অস্থলে আছেন আজ তেরো-চোদ্দ বছর। পুরনো অনেক কথাই তাঁর মুখ থেকে শুনলাম।

এখন মেলায় চলাচল করছে আড়াই শো তিন শো বাস। সেই সঙ্গে আসছে যাচ্ছে ট্রাক আর অগুন্‌তি সাইকেল। লোকের স্রোত পেছন থেকে ঠেলছে। কেউ যে দাঁড়িয়ে দেখে কিছু কেনাকাটা করবে তার উপায় নেই। তাছাড়া এবার চাষবাসও ভাল হয় নি খরায়। ফলে সে রকম বেচাকেনা নেই। বাজার আছে শুধু কাঠকাবাড়া আর কলার। এখন আর লোকে ততটা কিনতে আসে না, আসে দেখতে কিছুটা ভালমন্দ খায় দায়। ফলে হোটেল আর মিষ্টির দোকান অনেক বেড়েছে।

আগে এসব অঞ্চলে তো দোকানবাজার ছিল না। কিছু কিনতে হলে যেতে হত সিউড়ি, নয় দুবরাজপুর। গরুর গাড়িতে যেতে আসতে তিন চার দিন লেগে যেত। কেউ যখন মামলা-মোকদ্দমা কোর্ট-কাছারি করতে শহরে যেত, গোটা গ্রামের লোক বরাত দিত আর জয়দেবের মেলা থেকে কিনে রাখত সারা বছরকার যাবতীয় মালপত্র। কড়াই বালতি হাঁড়িকুড়ি কাপ-ডিশ। আর মনিহারি জিনিস। এখন হাতের কাছে দোকান-বাজার হয়েছে। তাছাড়া যারা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে, ইস্কুল-কলেজে যায়—দরকারের জিনিসগুলো তারাই কিনে আনে।

আগেকার আমলে জয়দেবের মেলায় বেশি বিক্রি হত এদেশের ছুতোর আর ডোমদের তৈরি বাঁশের বাঁশী আর কাঠের পুতুল। এব

রকমের ঘুরুনি ছিল, তার নাম ব্যাং-কুড়কুড়ি। সরবতী লেবু, টোপা কুল খুব বিক্রি হত।

আগেকার বৈষ্ণব বাউলরা এখন আর আসছে না। এখন আসছে সব আধুনিক ঢঙের। আগে দেহতত্ত্বের গান হত। এখন যা হচ্ছে সব পিউক ট।

লোকের সাজপোশাক রুচি এসবও অনেক বদলেছে। সব জাত-সম্প্রদায়ের ছেলেদেরই পরনে এখন প্যান্ট। মেলায় আগে চলন ছিল মুড়ি আর তেলেভাজার। আগে এ মেলায় ভাতডাল মাছমাংস রসুনপেঁয়াজ চলত না। এখন হোটেলের পর হোটেল।

মেলায় এখন বাইরের লোকই বেশি আসছে।

অতুলবাবু দুঃখ করে বললেন, এখনকার ছেলেছোকরার দল সাধুসন্ন্যাসীদের ঠিক আগের চোখে আর দেখে না। দেখে ঠাট্টা-তামাসা করে। যেন তারা গেরুয়া পরে লোক ঠকাচ্ছে, কাজ না করে সমাজের ক্ষতি করছে। এই হল এখনকার ভাবধারা।

তবে বাইরের লোক আসায় এখানকার কুনো স্বভাব বদলাচ্ছে। আগে মাল নিয়ে যার যেখানে মন হত বসে যেত। এখন বসবার একটা ছিরছাঁদ হয়েছে। কুঠো কাঙালীদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে মেলার বাইরে।

অঞ্চলে এখন গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট বসছে। গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না হবে, আলো জ্বলবে। আবার তার সার লাগবে চাষবাসের কাজে। মাঝে মাঝে এখানে কেরোসিন বেজায় দুর্মূল্য হয়। আগে জঙ্গলে প্রচুর কাঠকাবাড়া ছিল। জ্বালানির জন্যে ভাবতে হত না। বন এখন সরকারের সংরক্ষিত। আগে অঞ্চলের গরুও ছিল প্রচুর। এখন আবার আস্তে আস্তে গরুবলদ বাড়ানো হচ্ছে। আজকাল রসুই করতে ছ-সাত হাজার টাকা বেরিয়ে যায় শুধু জ্বালানি কিনতে। গোবর গ্যাস চালু হলে অনেক টাকা বাঁচবে।

এই অস্থলেব নাম জয়দেব মোহান্ত এস্টেট। বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহান্ত এই অস্থল চালান।

অতুলবাবুর মুখে সংক্ষেপে শুনলাম জয়দেবের কাহিনী আর এই অস্থল প্রতিষ্ঠার কথা।

জয়দেব গোস্বামী ছিলেন কবি। লোকে তাঁকে বলত জয়া ক্ষ্যাপা। তিনি আজ এখানে কাল সেখানে বাউল গান করে বেড়াতেন। গোড়ায় ছিলেন শিবভক্ত তান্ত্রিক যোগী। পরে সহজিয়া সাধনায় আকৃষ্ট হন। শেষ জীবনে হয়ে যান বৈষ্ণব।

শোনা যায়, পদ্মাবতী ছিলেন জগন্নাথ মন্দিরের ছোট দেবদাসী। সেখানে নাচগান করে দেবতার আরাধনা করতেন। তাঁর মা-বাবার ওপর একবার জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ হল—আমার এক আউলেবাউলে ছেলে আছে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব নামে। সর্বদাই থাকে অজয় নদীর ধারে শিবের মন্দিরে। সে আমার মানসপুত্র। পদ্মাবতীকে তার সেবাদাসী করে পাঠাও। তার খাওয়াদাওয়ার ঠিকঠাক থাকে না। কেউ খেতেও দেয় না। ঠাট্টা করে। মাও নেই বাপও নেই।

এইভাবে নাকি জয়দেব পদ্মাবতীকে পান। পদ্মাবতী নৃত্য দিয়ে রাধামাধবের আরতি করতেন। আর সেই নৃত্যছন্দে জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ লিখতে থাকেন।

শেষ জীবনে পদ্মাবতীকে রাধামাধবকে নিয়ে স্বহস্তলিখিত গীতগোবিন্দের পুঁথি হাতে জয়দেব চলে যান বৃন্দাবনে। সেখানে তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে ছেচল্লিশতম শিষ্য হন। জয়দেব দেহ রাখলে শততম চেলা রাধাবিনোদ ব্রজবাসী পায়ে হেঁটে এখানে এসে এই অস্থলের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশ এই অস্থল বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়। প্রত্যেক মকরসংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মৃতিতে মেলা শুরু হল। মঠ হল। মহল হল।

দামোদর ব্রজবাসী বিষয়সম্পত্তি বাড়াতে গিয়ে শেষ অবধি খুন

হন। ইংরেজ আমলে তাঁর ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে সুরেন ব্যানার্জী প্রায়ই এখানে এসে থাকতেন।

হোটেলে আমরা দর করে এসেছিলাম তিন টাকায় মুরগির মাংস আর ভাত। কিন্তু অতুলবাবু ছাড়লেন না। মন্দিরের নিরামিষ প্রসাদ খেতে ভালই লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে এসে গেলাম নদীর ধারে। নদীতে হাঁটুজলও হবে না। তারই মধ্যে কুঁজো হয়ে, হাঁটু ভেঙে গা ভিজিয়ে স্নান করছে শয়ে শয়ে পুণ্যার্থী।

রাধামাধবের মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় দুধারে কুষ্ঠরোগীরা ভিড় করে আছে। নদীর ধার বরাবর নেমে গিয়ে খুঁজে পাওয়া গেল বিখ্যাত সেই কলার বাজার।

যারা কলার ব্যাপারী তারা সবাই এসেছে চন্দননগরের আশপাশ থেকে। চাঁপা কলা এই এক জায়গাতেই হয়। বড় বড় কলার ছড়া দোকানের সামনে টাঙানো। মাটি দিয়ে ঢেকে কাঁচা কলা পাকানোর ব্যবস্থা। এত কলা যে দেখে ট্যারা হয়ে যেতে হয়।

একজনকে জিগ্যেস করলাম, এত কলা সব বিক্রি হবে কি?

সে একগাল হেসে বলল, খরার জন্যে এবার ফলন কম। নইলে আমরা আরও কলা আনতাম। মেলার তিনদিন গেলে তারপর দেখবেন কী রেটে কলা বিক্রি হয়। পুজোর পাট চুকে গেলে গ্রামের মুসলমানরা মেলায় আসবে। তখন তারা ঝেঁটিয়ে কলা কিনে নিয়ে যাবে। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করে তারা ফলার খাওয়াবে। সে একটা উৎসবের মত ব্যাপার।

নতুন কোনো জিনিস মেলায় চোখে পড়ল না। বটতলার দিকে লাইন করে পড়েছে ছাউনি। বোষ্টমদের আখড়া। রসকলিতে একেকজন বোষ্টমবোষ্টমীকে ভারি সুন্দর দেখায়। বাইরে থেকে যারা আসে তারা বাউল গান শুনতেই ব্যস্ত। যারা গান গায় না তাদের

দিকে খুব কম লোকই তাকায়। অথচ যতই নিরক্ষর হোক, এদের মুখের বাংলা যে কী অসামান্য তা যে শুনেছে সেই জানে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বসে শোনার। কিন্তু এই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তার আর সুযোগ হল না। দুর্গাপুরের কাছে এক বাবাজীর আখড়া আছে। আমাকে ঠিকানা দিলেন। মাঘী পূর্ণিমায় আমি যেন নিশ্চয় যাই।

ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে হেতমপুরের আশানন্দন চট্টরাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি যখন 'সন্দেশ'-এর সম্পাদক ছিলাম, আশানন্দন তখন ছড়া লিখত। এখন সে বাউলদের জন্যে গান লিখছে। তার 'দেশবিদেশের মানুষ গো, যাও এ বীরভূম ঘুরে'— এই গানটা খুব নাম করেছে।

নিজের গান নিজে বানায় এমন বাউল এখন বিরল। রেডিও সিনেমা জলসায় এখন বাউল গানের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাউলের জীবনচর্যার সঙ্গে তার গানের ফারাক হয়ে যাচ্ছে। এটাই বোধহয় কালের নিয়ম। এই বিচ্ছেদটাকে মেনে নিয়ে বাউল গানে এ কালের প্রাণের স্পন্দন যদি ভরে দেওয়া যায় তাতেও লাভ আছে।

যখন চলে আসছি দেখি এক আসরে গান হচ্ছে। দুটি ছোট ছেলে সে আসরের নায়ক। তার মধ্যে একজন—আরে, রাণীগঞ্জে যাবার সময় ওকেই তো ট্রেনে দেখেছিলাম। সেই এক প্যাণ্ট, সেই এক পোশাক। চোখেমুখে ক্লান্তির ভাব। কাল সারা রাত আখড়ায় আখড়ায় গান গেয়েছে।

আগের বার ওর নাম জানা হয় নি। এবার জেনে নিলাম। গুরুভক্ত বারুই। দুর্গাপুরের কাছে থাকে। ও কি ইস্কুলে পড়ে? খুব ইচ্ছে করছিল জানতে। কিন্তু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

এক যাত্রায়

প্রথমবার কলকাতাকে ছেড়ে যেতে ঝড়ুর সত্যিই খুব কষ্ট হয়েছিল।

ব্রিজ পেরিয়ে পেছনদিকে ফিরে দূর থেকে শহরটাকে একবার সে দেখবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লরির ওপর বড়-বড় কাঠের প্যাকিং বাক্সগুলো এমনভাবে স্তূপাকার হয়ে ছিল যে, পেছনে তাকিয়েও কিছু সে দেখতে পায় নি।

আর দেখতে না-পেয়ে হঠাৎ তার মন চলে গিয়েছিল কাঠের বাক্সগুলোর দিকে।

কী আছে ঐ বাক্সগুলোর মধ্যে ?

একটাতে আছে ডায়নামো। ব্যাণ্ডপার্টিতে থাকতে ও জিনিস ঝড়ু বিস্তর দেখেছে। অন্যগুলোতে কী আছে পুরো না জানলেও কিছুটা আঁচ করতে পারে।

রকম-রকম সাজপোশাক। রাজারানি মন্ত্রী-কোতোয়াল ব্রাহ্মণ-পুরুত সৈন্যসামন্ত সাধুসন্ন্যাসী রাক্ষস-হনুমান দেবতা-অসুর। যেমন চরিত্র তেমন পোশাক। তরোয়াল-ঢাল ত্রিশূল-কমণ্ডলু দণ্ড চামর। চুল দাড়ি দাঁত নখ মুখোশ।

ঝড়ু যেন মনশ্চক্ষে বাক্সগুলো হাঁটকায়।

আর আছে বড় বড় স্পট লাইট। রকমারি বাজনা। মাইক আর লাউড স্পীকার।

এরপরই সে-বাক্সটার কথা মনে পড়ায় ঝড়ুর জিভে জল এল সেটাতে রান্নার জিনিস। বড় বড় যজ্ঞিবাড়ির হাঁড়িকুড়ি হাতা খুন্তি।

উত্তরপাড়াকে ডানদিকে রেখে চওড়া রাস্তা পেয়ে লরি যখন জোর কদমে ছুট দিল, তখন সামনে বাধাবন্ধহীন আকাশটাকে দেখে হঠাৎ তার বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল। অনেক দিন পর এই প্রথম তার বাড়ি ফেরার খুব ইচ্ছে হল। ঠিক ফেরা নয়, টুক ক'রে গিয়ে একবার দেখে আসা। বাবার চুল এতদিনে নিশ্চয় সাদা হয়ে গেছে। ছোট-ছোট ভাইবোনেরা তো তখনও ঝড়ুর খুব ন্যাওটা ছিল।

গাঁয়ের লোকে যখন শুনবে, ঝড়ু আর সে-ঝড়ু নেই—এখন সে যাত্রাদলে লরির ক্লিনার, বছরে আট মাস সারা বাংলা তাকে চষে বেড়াতে হয়, খাওয়া-পরা বাদেও মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে হাতখরচা পায়—তখন সবাই তাকে খাতির করবে।

কিন্তু না, এখন কেউ রেলের টিকিট কেটে হাতে গুঁজে দিলেও ঝড়ু যাবে না। যাবে আট মাস পরে। যখন তার হাতে থাকবে এককাঁড়ি টাকা। বাবার জন্যে নিয়ে যাবে ধুতি, নতুন-মা'র জন্যে শাড়ি। আর ভাইবোনদের জন্যে দইমিষ্টি আর বই।

হ্যাঁ, আরও একটা কথা। ঝড়ুকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল আরও একটা জিনিস। তার ইয়াসিন নাম। ব্যাণ্ডপার্টিতে ঢোকার আগে ঝড়ুকে তার নাম বদলে হতে হয়েছিল ইয়াসিন। যাত্রাদলে ঢোকার আগে তাকে আবার যে-ঝড়ু সেই ঝড়ু হয়ে যেতে হয়েছিল। নইলে কর্তাবাবু তাকে নিতেনই না।

ঝড়ু এটা স্পষ্ট করেই জানে যে, নাম একটা হলেই হল। মানুষের সঙ্গে নামের সম্পর্কটা হল পাতানো। শুধু চেনবার সুবিধের জন্যে।

তবু কিন্তু ইয়াসিন নামটা ছেড়ে দিয়ে অনেকদিন অবধি ঝড়ুর খুঁতখুঁতুনি যায় নি। নামটার ওপর তার কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। অথচ করেই বা কী? নাম আঁকড়ে থাকলে চাকরি হয় না।

স্বনামে ফিরে গিয়ে ঝড়ুর খুব বাধো-বাধো ঠেকছিল। ও বুঝতে পারল বেশিদিন না প'রে ফেলে রাখলে জামার মতোই নিজের নামটাও নিজের সঙ্গে ঠিক ফিট করে না।

ঝড়ু তাকিয়ে দেখল, রাস্তার দুধারে কলাগাছ। দুপাশের ডানাগুলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে যেন উড়ে যেতে চাইছে। কচি-কচি চারায় সবুজ হয়ে আসছে ধানক্ষেত। চারপাশে কিছুই থেমে নেই। যেটা দূরের সেটা আস্তে, যেটা কাছের সেটা সজোরে ছুটছে। কেউ বসে নেই।

যে ছবিগুলোকে ঝড়ু এতদিন কলকাতার রাস্তায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, কলকাতা ছাড়াতেই তারা এমনভাবে একে একে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতে লাগল যে ঝড়ুর পক্ষে তাদের সামলানো শক্ত হয়ে পড়ল।

এই হুটোপাটির মধ্যে কখন যে তার চোখ জড়িয়ে এসেছিল, সে নিজেই তা টের পায় নি।

বুড়ো সর্দারজি তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, "এই ওঠ, ল্যাংচা—"

ঝড়ুর চোখে তখনও ঘুম লেগে। কিন্তু কথাগুলো সে স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল। সর্দারজি যত ভালই বাংলা বলুক, কাকে কী বলতে হয় সে জ্ঞানটুকু নেই। ঝড়ু যদি খোঁড়া হত, তাহলেও না হয় বদ্ রসিকতা বলে ধরা যেত। তা যখন নয়, তখন মুখে কিছু না বললেও বুড়োর কথায় ঝড়ু মনে-মনে ফুঁসতে লাগল।

কিন্তু খানিক পরেই সর্দারজি যখন তার হাতে একটা ঠোঙা তুলে দিয়ে বলল, "এই নে ঝড়ু, শক্তিগড়ের ল্যাংচা"—তখন ঝড়ুর চোখ ছানাবড়া। তার মানে বুড়োকে সে একেবারেই ভুল বুঝেছিল।

ঝড়ুর মনে হল—ইশ্, মানুষের সব ভুল যদি এমন মধুরভাবে ভাঙা যেত তাহলে কী ভালই না হত!

তারপর লরি গিয়ে থেমেছিল বিষ্ণুপুরে। তার একটু পরেই

ঝড়ুর চোখ ঘুমে এমন জড়িয়ে গিয়েছিল যে, ভোরের আগে কেউ তা খুলতে পারে নি।

ঝড়ুর সেসব এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

কলকাতা থেকে প্রথমবার রওনা হওয়ার দিনটা যেন একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে কেটেছিল।

যাত্রাদলের কর্তাবাবু দুটো-দুটো ক'রে খাঁকির আনকোরা নতুন প্যান্টশার্ট, একজোড়া রবারের হাওয়াই চটি, একটা গামছা আর কাঁধেঝোলানো ব্যাগ একটা দিয়ে বলেছিলেন, 'যত্ন ক'রে রাখিস, চুরি যায় না যেন। মাইনের ওপর এটা ফাউ। বছর ঘুরলে আবার নতুন একসেট কাপড়জামা পাবি।'

চাকরি পেয়ে ঝড়ুকে রাস্তা ছেড়ে যাত্রাদলের আপিসে উঠে আসতে হয়েছিল। বড় রাস্তা থেকে উঠে সরু একটা গলি পেরিয়ে বাঁদিকে ওঠার আখাম্বা সিঁড়ি। বাড়িটা যেন মান্ধাতার আমলের। বালি-ওঠা স্যাঁতসেঁতে দেয়াল। এঁদো গলি। ইঁট বার করা সিঁড়ি। ধারেকাছে কে থাও চৌবাচ্চায় কল থেকে জল পড়ার শব্দ। ছ্যাতলা-পড়া উঠোনের সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

সব মিলিয়ে ঝড়ু কেমন যেন থ হয়ে গিয়েছিল। জীবনে সে এই প্রথম দালানকোঠার ভেতরটা কী রকম তা দেখছে। দেখছিল না তো, যেন গিলছিল। সে ভাবতেই পারে নি, ভেতর থেকে বাড়িগুলোকে ঠিক এ-রকম দেখতে হয়। ওপরে উঠে রাস্তার দিকে দুটো ঘর। একটাতে কর্তাবাবুর গদি। অন্য ঘরটাতে হয় যাত্রার মহলা। বাইরে একফালি বারান্দা। সাইনবোর্ড টাঙানো আর আজেবাজে জিনিস স্তূপাকার করে রাখা ছাড়া সেটা আর কোনো কাজে লাগে না। বারান্দাটুকু দেখে ঝড়ু নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

এরপর তাকে যখন সিঁড়ির পাশে চারদিক-বন্ধ এক চিলতে জায়গা দেখিয়ে বলা হল, রাত্তিরে এইখানে তুই শুবি—তখন ঝড়ুর

মুখ শুকিয়ে গেল। খোলামেলা রাস্তায় এতদিন যে থেকে এসেছে তার পক্ষে একটু ঘাবড়াবারই কথা বটে।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে চলে যাবার পর বাইরে সারা রাত জ্বালানো থাকত আলো। ঘুমোতে পারুক আর না পারুক, শুয়ে-শুয়ে পাহারা দেওয়ার কাজটা তো হতে পারবে। ঝড়ুকে জায়গা দেওয়ার পেছনে কর্তাবাবুর নিশ্চয় এ হিসেবটাও ছিল।

ঝড়ুর চোখে পড়েছিল, যাত্রাদলের আপিসঘরের একপাশে ডাঁই করা আছে বাংলা বই। সে-সব বই কেউ বড় একটা ছুঁত না। ঝড়ু সেখান থেকে বই নিয়ে তার ব্যাগে জমা করে রাখত। বই পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে কোথা দিয়ে যে রাত কাবার হয়ে যেত, ঝড়ু টেরই পেত না।

গোড়ার গোড়ায় টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা ছাড়া ঝড়ুর কোনো কাজ ছিল না। যখন মহলা হত, কান দুটোকে সে খাড়া করে রাখত। কথাগুলো তার মনের মধ্যে গেঁথে যেত।

ঝড়ুর মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগত। সাদামাঠা সব বাংলা কথা যা লোকের মুখে মুখে ফেরে, সেইসব কথাই যখন ভাল লেখকের লেখায় কিংবা ভাল অভিনেতার গলায় স্থান পায় তখন তার চেহারাই আলাদা। গায়ের ধুলোগুলো ঝাড়লেই তাদের সোনার টুকরো বলে মনে হয়।

দল যখন বাইরে যায়, তখনও ঝড়ুকে লরির ভেতরে শুয়ে রাত-পাহারায় থাকতে হয়। যতক্ষণ না ঘুম আসে ঝড়ু বই পড়ে। আলো তো সারারাত জ্বালানোই থাকে।

ঝড়ুর শুধু একটা দুঃখু, যাত্রাদলে থেকেও যাত্রা দেখা তার কপালে নেই। সন্ধ্যের পর তাকে গিয়ে লরির ভেতর সেঁধোতে হয়। আর ভোর হলেই শুরু হয়ে যায় গাড়ি ধোয়ামোছার কাজ। বুড়ো সর্দারজির ঝড়ুকে খুব পছন্দ। ঝড়ু কখনও কাজে ফাঁকি দেয়

না। গাড়িটাকে সবসময় ঝকঝকে তকতকে রাখে। ইঞ্জিনের ভেতরটাও সে ঘষামাজা করে। কলকব্জাগুলোর কোনটা কী, এখন তার মুখস্থ। সর্দারজি খুশি হয়ে তাকে তালিম দেয়।

যাত্রায় যারা পার্ট করে, তাদের সঙ্গেও ঝড়ুর খুব ভাব। ঝড়ু হাসিমুখে তাদের সব ফাইফরমাশ খেটে দেয়।

হাতে যখন কাজ থাকে না ঝড়ু তখন টোটো করে ঘোরে। লোকের সঙ্গে দুমিনিটে সে ভাব করে ফেলে। তাদের বাড়িতে যায়। হাঁড়ির খবর নেয়। যাত্রার দলের লোক তো ঝড়ু। তাই তার আলাদা খাতির

যে রাত্তিরে প্রথমবার সে বিষ্ণুপুরে পোঁচেছিল, সেই রাত্তিরটার কথা ঝড়ুর আর এখন ভাল মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, অনেক বছর পর ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে তার বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল। আর ভোরবেলায় পাখির দল ডেকে-ডেকে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল।

কলকাতায় ভোর হওয়া বলতে ঝড়ু বুঝত রাস্তার আলোগুলো সব নিভে যাওয়া। বাইরে কিন্তু রাত পোহানোর ব্যাপারটাই অন্য। পাখিগুলো যখন ডেকে-ডেকে গলা ভেঙে ফেলছে সেই সময় আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে আসে অন্ধকার। দোকানে চায়ের গাঢ় লিকারে দুধ ঢেলে দিলে যেমনভাবে রং বদলায় ঠিক তেমনিভাবে।

বিষ্ণুপুরে প্রথম দিনটা কলকাতার জন্যে ঝড়ুর কী যে মন কেমন করেছিল বলার নয়। গোড়ায়-গোড়ায় তার মনে হচ্ছিল কানে যেন তার তালা লেগে আছে। নইলে চারপাশে কোনো আওয়াজ নেই কেন?

বালতিতে ক'রে ডোবা থেকে জল আনতে গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে ঝড়ু দাঁড়িয়ে পড়ল। তার হাতের নাগালের মধ্যে ফুটে রয়েছে পদ্মফুল। ঝড়ু বেচারা নিজেকে সামলাতে না পেরে পটাপট কয়েকটা

পদ্মফুল ছিঁড়ে নিল। তারপর সেই ফুলগুলো লরির মাথায় একটা-একটা করে সে গুঁজে দিল।

পায়ে হেঁটে ঘুরতে গিয়ে ঝড়ু দেখে বিষ্ণুপুর বেশ বড় শহর। ডোবা, পুকুর আর মাঠঘাট থাকলেও বিস্তর লোকের বাস। দালান-কোঠাই বেশি। সেইসঙ্গে এঁদো বস্তির মতো বাড়ি।

দুদিনের বায়না ছিল। সেইসঙ্গে গুটিয়ে ফেলতে একদিন। তিন-দিনে ঝড়ু হাতে পেয়েছিল পাঁচ ঘণ্টা সময়। তার মধ্যে যতটা যা দেখাশোনা যায়। দেখার চেয়ে শোনাই বেশি।

চোখে দেখা আর কানে শোনা—এর দৌড় কিন্তু বেশি নয়। কথাটা ওকে প্রথম বলেছিলেন লালমোহনবাবু। এই বিষ্ণুপুরেই তার সঙ্গে ঝড়ুর হঠাৎ আলাপ। শহরের পুরনো মন্দিরগুলো দেখে ঝড়ু ফিরছিল।

ভাঙা পাঁচিলগুলোর ভেতর ঝোপজঙ্গল হয়ে রয়েছে তার মধ্যে মাথা-উঁচু-করা মন্দির। ভাঙা-ভাঙা ইঁট। এখনকার ইঁটের মতো নয়। নিশ্চয় অনেকদিন আগের তৈরি। সারা গা জুড়ে ক্ষয়ে-যাওয়া কিংবা ভাঙা পোড়ামাটির মূর্তি।

ঝড়ু উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখল কোথাও কোনো পুরুতঠাকুর নেই। পুজো দিতেও কেউ আসছে না। মন্দির রয়েছে অথচ পুজোপাঠ নেই। এ আবার কোন্‌দেশী ব্যাপার। কাউকে যে জিগ্যেস করবে তারও উপায় নেই। মন্দিরের উঠোন একেবারে ফাঁকা।

ফিরে আসার সময় একটা পলেস্তারাহীন বাড়ির ধারে এসে ঝড়ু দাঁড়িয়েছিল। জানলা দরজা খোলা হলেও বাড়িটাতে লোকে থাকে বলে মনে হয় না। ঘরের ভেতর দেয়াল জুড়ে বই আর রকমারি পাথরের মূর্তি।

'শোনো, খোকা।'

চমকে তাকাতেই ঝড়ু দেখে, বারান্দায় ব'সে চায়ের কাপ হাতে

এক ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন। গায়ে গেঞ্জি। অত যে জ্ঞানী-গুণী মানুষ চোখে দেখে বোঝবার জো নেই।

পরে ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধে ঝড়ু অনেক কিছু জেনেছিল। ওঁর নাম লালমোহন সিংহ। ওটা কারো বসতবাড়ি নয়। সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন। এক সময় স্বদেশী করতেন। এখনও স্বদেশ নিয়েই ডুবে আছেন। তবে কাজটা অন্য। ভুলে-যাওয়া কথাগুলোকে দেশের লোককে মনে করিয়ে দেওয়া।

এ বাড়ির একটা-একটা ক'রে ইঁট গাঁথা হয়েছে চাঁদার টাকায়। শেষ পর্যন্ত টাকায় টান পড়ায় পলেস্তরাটা আর হয়ে ওঠে নি।

লালমোহনবাবু ঝড়ুকে সব ঘুরিয়ে দেখালেন। মেঝের ওপর কাগজ বিছিয়ে পুরনো পুঁথির পাতাগুলো শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া পাথর আর ধাতুর মূর্তি। আলমারিগুলোতে ঠাসা বই। একসঙ্গে এত বই ঝড়ু জীবনে সেই প্রথম দেখল।

লালমোহনবাবু তাকে অনেক কিছু বলেছিলেন। পাথুরে যুগ আর কাঁসাই নদীর কথা। বেশির ভাগই ঝড়ুর মাথায় ঢোকে নি। কিন্তু শুনতে খুব ভাল লাগছিল বলেই ঝড়ু মুখ ফুটে কিছু বলে নি। তাছাড়া লালমোহনবাবুরও যে বলতে ভাল লাগছিল।

ঝড়ু সেদিন এটুকু বুঝেছিল যে, শুধু চোখকান থাকলেই হয় না। সেইসঙ্গে অনেককিছু জানতে হয়। সব কিছুরই একটা আগে পরে আছে। তার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে হয়।

কর্তাবাবু একদিন আসছিলেন রিকশায়। যে চালাচ্ছিল তার বয়েস এত কম যে, প্যাডেলেও তার পা ভাল ক'রে পৌঁছোয় না। রোগা হাড়জিরজিরে চেহারা। এদিকে কর্তাবাবুর ভুঁড়ির ওজনই তো হবে ফেলে ছেড়ে দশ কে-জি।

দেখে ঝড়ুর হাসিও পাচ্ছিল দুঃখও হচ্ছিল।

রিকশা থেকে নেমে কর্তাবাবু ছেলেটার সঙ্গে এমন দরাদরি শুরু ক'রে দিলেন যে, ঝড়ুর রীতিমতো লজ্জা করতে লাগল। কর্তাবাবু আট আনার বেশি দেবেন না, ছেলেটাও বারো আনার কমে নেবে না। শেষ পর্যন্ত রফা হল দশ আনায়।

ছেলেটা যখন চলে যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে ঝড়ু তাকে রাস্তায় ধরল। ঝড়ুর হাতে একটা চকচকে সিকি।

'কর্তাবাবু এটা তোমাকে দিলেন।'

ছেলেটা হেসে ফেলল। বয়স কম হলেও দুনিয়াটা সে এরই মধ্যে চিনে নিয়েছে।

ঝড়ু জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

ওর নাম দুলাল নন্দী। পুকুরের পাশ দিয়ে যে গলিটা চলে গেছে, সেই গলিটার শেষে ওদের বাড়ি।

ঝড়ুর খুব ইচ্ছে ওদের পাড়ায় গিয়ে এখানকার লোকজনেরা কী করে, কীভাবে থাকে একটু দেখে আসার।

দুলাল বলল বিকেলে ও বাড়ি থাকবে। এখন ইস্কুল ছুটি। তাই দিনের বেলায় রিকশা চালায়। ইস্কুল খুললে রিকশা চালাবে সন্ধ্যে-বেলায়। ঝড়ু যেন নিশ্চয় যায়। ওকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে।

হঠাৎ দুলালকে ঝড়ুর খুব আপন ব'লে মনে হল।

বিকেলে দুলালদের বাড়ি খুঁজে বার করতে ঝড়ুকে একটুও বেগ পেতে হয় নি। দুলাল বই হাতে নিয়ে দাওয়ার ওপর ব'সে রাস্তার ওপর সমানে নজর রেখেছিল!

দুলালের মা যখন একবাটি মুড়ি আর তালের গুড় ঝড়ুর সামনে রেখে একটা হাতপাখা নিয়ে কাছে এসে বসলেন নিজের মা-র কথা মনে পড়ে চোখে তার জল এসে গিয়েছিল।

ঘুরে ঘুরে দুলাল সব দেখিয়েছিল। ঝড়ুও সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল।

দুলালদের পাড়ার সবাই শঙ্খশিল্পী। শাঁখের কাজের জন্যে এক সময়ে সারা দেশে এ পাড়ার খুব নামডাক ছিল।

যাঁদের বছর পঞ্চাশ বয়েস, তাঁরা বললেন, যখন আমাদের গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে তখনও দেখেছি, বড় বড় করাত ঘষার শব্দে সারা পাড়া গমগম করত। এখনকার চেয়ে তখন ছিল দুনো লোক। কাজের কোনো অভাব ছিল না। সবাই খেতে পরতে পেত। এখন দিন চালানোই দুষ্কর।

ঝড়ু আশপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ওঁদের কথার একবর্ণও মিথ্যে নয়। প্রত্যেকটা ঘর থেকে অসুরের মতো একটা একটা ক'রে বিকট দারিদ্র্য চোখ পাকিয়ে তাকে যেন দেখছে।

দুলালের এক কাকা ঝড়ুকে ডেকে নিয়ে তুলল সাজানো গোছানো একটা দোকানে। কাঁচের আলমারির মধ্যে থরে থরে সাজানো শাঁখের তৈরি অসাধারণ সব শিল্পকাজ। শাঁখ দিয়ে যে এত রকমের জিনিস হতে পারে, না দেখলে ঝড়ু কখনও ধারণাই করতে পারত না।

দেখে ফেরবার সময় দুঃখ করে তিনি বলতে লাগলেন, 'এর চেয়েও ভাল কাজ করতে পারে এমন কারিগর এখনও আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু থাকলে হবে কী, ভাল জিনিস ভাল দামে কেনবার লোক কোথায়?'

কথাটা ঝড়ু মনে-মনে ঠিক মানতে পারছিল না। ব্যাণ্ড পার্টিতে থাকার সময় টাকাওয়ালা লোক সে তো কম দেখে নি। তারা তো এসব জিনিস মুঠো-মুঠো ক'রে কিনে নিতে পারে। ঠিক সেই সময় কর্তাবাবুর মুখটা মনে পড়ে যাওয়ায় পেটের কথা সে মুখে আনতে পারল না। টাকা কি কর্তাবাবুরই কম?

পাড়ার সকলের কাছেই ঝড়ু একই কথা শুনল। দিনকাল এখন বদ্‌লে গেছে। যাদের কেনবার মন আছে তাদের পয়সা নেই। যাদের পয়সা আছে তাদের মনটাই নেই।

ঝড়ুর দিকে তাকিয়ে দুলাল হাসল।

পাকাচুল এক বুড়ো বললেন, 'ভাল জিনিসই বা হবে কেমন ক'রে? শুধু হাত থাকলেই তো হয় না।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আগে শাঁখ আসত সিংহল থেকে। খুব উৎকৃষ্ট ধলা জাতের সালামৎ শাঁখ। ধবধবে সাদা। সে জায়গায় এখন? শাঁখ আসে আন্দামান, মাদ্রাজ, রামেশ্বর থেকে। আগে আসত পুরো মাপের বড় বড় শাঁখ। সে-সব তো কতদিন আর চক্ষেই দেখি না।'

তারপর উঠল দামের কথা। শাঁখের দাম বেড়েছে তিরিশ গুণ।

ঝড়ু দেখল সবাই এ বিষয়ে একমত যে সমুদ্রের ধার থেকে শাঁখ যারা কুড়োচ্ছে তারা পাচ্ছে নামমাত্র পয়সা। আসলে তাদের কাছ থেকে শাঁখ তো আর সরাসরি শাঁখারীদের কাছে আসছে না। আসছে বহু হাত ঘুরে। তারা যেভাবে দাঁও মারে, তাতে হাত না বলে থাবা বলাই ভাল।

এর ওপর কিনতে হয় লাল নীল কালো রং আর গালা। তার দামও আগুন।

যেখানে শাঁখের কাজ হয় সেই জায়গাগুলো ঝড়ু ঘুরে-ঘুরে দেখল। হাতুড়িই আছে তিন-চার ধরনের। প্রথমে শাঁখগুলো মাপসই ক'রে নিতে হয়, তারপর দিতে হয় ফোঁড়। ঘষা আর কাটার জন্যে আছে করাত, ফাইল, শিল আর রড। নকশা করার জন্যে বাটালি আর ভ্রমর। তাছাড়া বাঁশের খোঁটা।

চাদরে গা-মাথা জড়িয়ে একজন দাওয়ার ওপর ব'সে জ্বরে কোঁকাচ্ছিল। ঝড়ু জিগ্যেস করল, 'আপনি কি কারিগর?' লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, 'আগে ছিলাম। এখন কলের মজুর।'

ঝড়ু বুঝতে পারছিল না। দুলাল তাকে বুঝিয়ে দিল।

দুলাল বলল, 'এখানকার পাঁচটা পরিবার অবস্থা ফিরিয়ে হয়ে গেছে মহা যম—মানে, ঐ মহাজন আর কি। তারা কাটবার আর

ঘষবার কল এনে বসিয়েছে। এমন কল যে ত্বজনকে কাজ দিয়ে তেরো জনকে করে দেয় কাজের বার। ফলে, ঘরে ঘরে এখন বেকার। যারা কাজ পায়, তারাও আট ঘণ্টা খেটে রোজ পায় আট টাকা। ছোট সাইজের হলে হুনো খাটুনি হাফ রেট। কলের মালিকরা বালার কাজ আগেই হাত ক'রে নিয়েছিল। গরিবের দল আংটির কাজটা কায়ক্লেশে টিঁকিয়ে রেখেছিল। মহাযমেরা সেদিকেও এখন হাত বাড়িয়েছে।'

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

ঝড়ুকে বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে হুলাল বলল, 'কাল নিয়ে যাব একটা মজার জিনিস দেখাতে।'

ঝড়ু পরের দিন হুলালদের বাড়িতে ইচ্ছে ক'রেই একটু বেলা ক'রে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল হুলালকে দেবার জন্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের বই। কলকাতা থেকে আসবার সময় রাস্তাতেই তার পড়া হয়ে গিয়েছিল।

হুলালের মা তাও মোয়া আর নাড়ু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না।

যেতে যেতে ঝড়ু জিগ্যেস করল, 'কী মজার জিনিস রে?'

হুলাল বলল, 'সে তুমি জন্মেও দেখ নি।'

'তাও বল্ না, কী জিনিস?'

'তাস।'

'ও হরি, তাস?' ব'লে ঝড়ু হোহো ক'রে হেসে উঠল।

'তুমি হাসছ? তাস মানে কি আর যেমন-তেমন তাস?'

'তাস আবার অন্য কী রকমের হবে রে?'

'আগে দেখই না।'

হুলাল যে বাড়িটাতে গিয়ে কড়া নাড়ল তার একতলার ভিৎ বেশ উঁচু। পৈঁঠে দিয়ে উঠতে হয়।

যে এসে দরজা খুলে দিল, তার বয়স কম। তবে ঝড়ু আর দুলাল দুজনের চেয়েই সে বড়।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই দুলাল ব'লে উঠল, 'কই বাঁশরীদা, দেখাও তো তোমাদের দশাবতার তাস! ঝড়ুদা তো বিশ্বাসই করতে চায় না, টেক্কা সাহেব বিবি গোলাম ছাড়াও তাস হতে পারে। দেখাও তো তাড়াতাড়ি।'

বাঁশরী তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'বাপ্‌রে, তুই দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস। বোস্ বোস্—আগে খুঁজি, তারপর তো।'

তারপর ঝড়ুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বয়েসে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তুমি বলছি। কিছু মনে করলে না তো?'

'বা রে, মনে করব কেন? তুমি শুনতেই তো ভাল লাগে।'

'আমার নাম বাঁশরী ফৌজদার। স্কুল ফাইনাল পাশ ক'রে এখন আমি পাত্রসায়রে ছোট একটা চাকরি করি। এক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম। কাল সকালেই আবার চলে যেতে হবে। তবে দুলাল কিন্তু ঠিকই বলেছে। দশাবতার সত্যিই কিন্তু অন্য রকমের তাস। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি।'

ব'লে বাঁশরী তাকের বইপত্র সরিয়ে দশাবতার তাস খুঁজতে লাগল। না পেয়ে গজগজ করতে থাকে, 'কোথায় যে সব রাখে···। ছোট ভাইটা একটা হনুমান।'

বলতে বলতে বাঁশরীর ছোট ভাই এসে হাজির। 'দেখো তো দাদা, কাঁচের আলমারিটায়।'

শেষকালে অনেক খুঁজে পেতে দুটো মাত্র তাস উদ্ধার করা গেল। তাও রংগুলো খুব জ্বলজ্বলে নয়।

তাস দেখে ঝড়ু সত্যিই অবাক। তাস তো হয় চৌকোনা। এ একেবারে ফুটবলের মতো গোল। তার মধ্যে ছবি আঁকা।

বাঁশরী বলল, 'এক সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা এই দশাবতার তাস নিয়ে খেলত। পাঁচজন খেলুড়ে গোল হয়ে বসত। প্রত্যেককে

ছ'গণ্ডা করে তাস বেঁটে দেওয়া হত। চারটেতে এক গণ্ডা। মোট একশো বিশটা তাস। খেলা হত পয়সা বাজি রেখে। রাজাদের দেখাদেখি হেঁজিপেঁজি জমিদারদের মধ্যেও নিশ্চয় দশাবতার তাসের চলন ছিল। ফলে, ফৌজদারদের তখন তাস তৈরি ক'রে আয় হত ভালই। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। কার দায় পড়েছে দশাবতার কিনবে। তাই, এ বাড়িতে কখনও তৈরি তাস পাওয়া যাবে না। কেউ যদি শখ ক'রে অর্ডার দেয় তখন বাড়িসুদ্ধু লোক তাস তৈরি করতে বসে যাবে। তাও কেউ খেলবার জন্যে কেনে না, কেনে ঘর সাজাবার জন্যে। এ দুটো তো ফেলে-দেওয়া তাস। এ থেকে বোঝাই যাবে না আসল তাস কী রকমের হয়।'

বাঁশরী কথা বলছিল বেশ গুছিয়ে। তাকে থামিয়ে দিয়ে হাতে চায়ের কেটলি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাঁশরীর মা। দুলালের দেখাদেখি ঝড়ুও উঠে তাঁকে প্রণাম করে এল।

বাঁশরীর বাবা বাড়িতে ছিলেন না। তাস তৈরি ক'রে যখন আর পেট চলছিল না তখন এক হাকিম দয়াপরবশ হয়ে তাকে নাইট-গার্ডের চাকরি দিয়েছিলেন। তাও আবার ক-অক্ষর গোমাংস। কোনোরকমে নামসই করতে পারতেন।

শুধু তাস তৈরি ক'রে চলে না ব'লে তাস-শিল্পীদের কেউ হয়েছে কুমোর, কেউ রাজমিস্ত্রি।

বাঁশরীর মা বললেন, "একশো বিশটা তাস তৈরি ক'রে পাওয়া যাবে খুব বেশি হলে সত্তরটা টাকা। এক সেট তাস করতে দিন কুড়ি সময় লাগে। মালমশলার খরচই পনেরো-বিশ টাকা। বাড়ির সবাইকে হাত লাগাতে হয়। যা খাটুনি, তাতে অত কম মজুরিতে এ বাজারে পোষায় না। কাজেই তাস তৈরির এই জাতব্যাবসাটা এখন উঠে যাচ্ছে।'

ঝড়ু আর দুলালকে চা-বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে বাঁশরীর মা বলতে লাগলেন, 'তাও আবার এ কাজের অনেক ভজোকটো। প্রথমে তো

তেঁতুলবিচি ভেজে নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখো। তারপর শিলে মিহি ক'রে বেটে গরম কড়াইতে ঘেঁটে চিট তৈরি করতে হবে, এরপর মেঝেতে খেজুরপাতার তালাই পেতে তার ওপর পুরনো ন্যাকড়া বিছিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দুপিঠেই তিন পেঁাচ পুরু ক'রে কাঁই লাগাতে হবে। চিট আর খড়ি একসঙ্গে গুলে ছ-বার লেপে দিয়ে ছ-বার শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রথমে চৌকো, তারপর তাকে গোল ক'রে কেটে একশো বিশটা টুকরো করতে হবে। ভালো রোদ পেলে জমিটা তিন-চার দিনের মধ্যেই তৈরি ক'রে ফেলা যায়। তারপর বারো আনা সিরিশ আঠায় সিকিভাগ খড়ি মিশিয়ে তা দিয়ে গোল টুকরো-গুলোর চারপাশ পালিশ করে নিতে হবে। এরপর সামান্য জল ছিঁটিয়ে কাঁচের নোড়া দিয়ে ঘষলে জমি প্লেন হয়ে যাবে। তারপর তার ওপর তুলি বুলিয়ে দশ রকম রং দিয়ে একরঙা ক'রে ছবি এঁকে তৈরি হবে দশাবতার তাস।'

রাস্তায় বেরিয়ে ঝড়ু দুলালকে বলল, 'কাল চলে যাচ্ছি। তোকে আমি মধ্যে-মধ্যে চিঠি দেব।'

দুদিনেই তুমি থেকে তুই হয়ে গিয়ে দুলাল বুঝল, ঝড়ুর সে খুব কাছে এসে গেছে। চোখের জল চাপার জন্যে কোনো কথা না বলে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুলাল বাড়ির দিকে ছুটে চলে গেল।

ঝড়ু খানিকক্ষণ একই জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকল।

ভুবননগর এড়িয়ে

পিঠে বোঁচকা। কাঁধে ঝোলা। ঘাড় আপনি নুয়ে এসেছে।

বিনয়ভবন পেরিয়ে হিহি-করা মাঠ। তারপর একটানা ওলান জমি। বাউলবৈরাগীদের তালি-মারা আলখাল্লার মত টুকরো জোড়া দেওয়া দেওয়া ধানক্ষেত। আলের ওপর দিয়ে তেড়াবাঁকা এলোমেলো পায়ে-চলার রাস্তা। ঘাড় টেড়ি করে হাঁটতে গেলেই হোঁচট খেয়ে পা মচকাবার সমূহ ভয়।

সামনে অনেক দূরে বাঁশবন। ভুবনডাঙা গ্রাম। তার মাথার ওপর পেরিস্কোপের মত উঁচিয়ে আছে চালকলের চিমনি। আকাশে আড় হয়ে মটকা মেরে রয়েছে জলকলের ট্যাঙ্ক।

আমার আগে আগে তরতরিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বোধহয় ভুবন-ডাঙারই কোনো মেঝেন। মাথায় গামছা পাকিয়ে বিঁড়ের মতন করে বসানো। তার ওপর দুধ কিংবা তেলভর্তি একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডাবরি। পিঠে পিছমোড়া করে বাঁধা দুধের বাচ্চা। দুহাত ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে সে মাথার ভার সাম্‌লে হাঁটছিল।

টুরিস্ট লজ্‌টা কোথায়, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে স্রেফ জানে না বলল। হয় সে সত্যিই জানে না, নয় আমার ভাষা বোঝে নি কিংবা এক কথায় সে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল। তিনটের কোনোটাই আমার কাছে খুব সুখের ব্যাপার বলে মনে হয় নি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এক লপ্তে তিনটেই সত্যি। জানে না, বোঝে না এবং চায় না।

ক্ষেতের পর ক্ষেত পেরিয়ে ভুবনডাঙার উঁচু পাড়ের ওপর উঠে পেছনে তাকালাম। মনে হল, এখান থেকে শান্তিনিকেতন ঢের দূর। ভুবনডাঙার ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে এক অন্য ভুবন, যেখানে বিশ্বের ঠাঁই।

আগে সবটাই ছিল আস্ত ভুবননগর। ভুবনডাঙা নামটা হয়েছে পরে।

রবিঠাকুর ছেলেবেলায় বোলপুর ইস্টিশানে নেমে আশ্রমে যেতেন পাল্কিতে। গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিশ্চয় অনেক ঘুররাস্তায় যেতে হত। এখন তো নাকের সোজা রাস্তা। গাড়ি দূরের কথা, সাইকেল রিক্সাও এখন হুস্ করে চলে যায়। শান্তি-নিকেতনের লোক এটা সেটা কিনতে বোলপুরের বাজারে টুক করে চলে আসে।

আমি এবার মাঠ ভেঙে হাঁটা রাস্তায়। একালে ভদ্রলোকেরা এভাবে আলটপ্‌কা হয়ে কম আসে।

যেখানে এসে উঠলাম সেটা একটা অজ পাড়াগাঁ। কবর দেখে ঠাহর হয় মুসলমান পাড়া। উঠোনে গড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে গরুর গাড়ি। একপাশে গাদা করা খড় আর জাবনার নাদা। নাকে সর্দি নিয়ে একপাল ছেলেমেয়ে আদুড় গায়ে আমার দিকে এমন-ভাবে চেয়ে রয়েছে যেন আমি অন্য কোনো দেশের মানুষ।

দেশ তো তবু পরের। আমাদের কাউকে কাউকে ওরা এমন কি অন্য কোনো গ্রহের লোক বলেও ভুল করে। বছরে একটা দিন ওরা দেখে আকাশ থেকে পড়ে ডানাঅলা রথ। তার আগে থেকেই মাঠে মাঠে বসে যায় বন্দুকঅলা সেপাইদের ছাউনি। বউঝিরা বাইরে বেরোয় না। খুব ডাকাবুকোরাও তখন শান্তিনিকেতনের কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। রথের রথীকে চর্মচক্ষে দেখে এখানকার খুব কম লোক। বাকিরা দেখতে পায় কাগজের ছাপা ছবিতে।

গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে আন্দাজে শেষ অবধি পেঁাছে গেলাম বোলপুর শহরে।

ব্যস, ফুরিয়ে গেল মাটির বাড়ি আর খড়ের চাল। বড় বড় পাকা দালানের আড়ালে পড়ে গেল রোদে-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা আর মাটির দেয়ালে হেলান দেওয়া মই-লাঙল। আর আজকের উপেক্ষিত ভুবনডাঙায় পোড়ামাটির সেই তোরণ, যেখানে একবার পড়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পদধূলি।

শান্তিনিকেতনের এপারে ভুবনডাঙা। তার গায়ে গা দিয়ে এখানেও এক অন্য জগৎ।

এক ঠিকেদারের তিন তিনটে চোখ-ধাঁধানো বিশাল বাড়ি। গেটের গায়ে মাধবীলতা। এক সময়ে তিনি নাকি দেখতেন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন। ঠিকেয় ভুল হওয়ার সংখ্যা, ইদানীং দেখা যাচ্ছে, খুব কম নয়।

বোলপুরে এমনিতেই এখন জমি কেনা, বাড়ি করার হিড়িক পড়ে গেছে। হয়ত আর বছর কয়েকের মধ্যেই ভুবনডাঙায় গরিব-দুঃখীর পাট উঠে যাবে। তাদের ভিটেমাটি চাটি করে সেখানে হবে পয়সাওয়ালাদের নয়া বসত।

এ শতাব্দীর গোড়াতেও বোলপুর ছিল নিতান্ত গণ্ডগ্রাম। লোক-সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কিছু বেশি। বাড়তে বাড়তে বছর ষোল আগে সেই সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল প্রায় আট গুণ। এখন সেটা আরও বেড়ে ষোলগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে কিছু অস্থায়ী। ব্যাবসা চাকরি বা বেড়ানোর সূত্রে বা দীর্ঘ মেয়াদে এসে তারা থাকে। একাংশ এসেছে দেশভাগের পর বাদবাকি প্রায় সবাই এসেছে এই জেলারই নানা অঞ্চলের গ্রামগঞ্জ থেকে।

গ্রামে যাদের জমি জায়গা নেই বা কাজের অভাব, গ্রাম ছেড়ে তারা শহরে চলে আসছে রুজিরোজগারের ধান্ধায়। গ্রামের যারা

পয়সাওয়ালা তারাও শহরে জমিজায়গা কিনছে, ঘরবাড়ি তুলছে। ছেলেপুলেদের কলেজ-ইস্কুলে পড়ানো, সপরিবারে এসে শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা, গাঁয়ের টাকা শহরে এনে খাটানো—এসব কারণ তো আছেই। সেইসঙ্গে আছে শহরস্থ হয়ে গাঁয়ের লোকের চোখে জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। মনে হচ্ছে, ভুবনডাঙাকে কোণঠাসা করতে শেষ পর্যন্ত এখানকার আদিবাসীদের স্রেফ তারা উঠিয়ে তবে ছাড়বে।

স্বাধীনতার পর গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হয়েছে একটার পর একটা জনস্রোত। এক তো জমিদারি উচ্ছেদের পর। তারও পরে ভাগ-চাষীরা যখন আইনগত কিছু সুযোগ-সুবিধে পেল ঠিক সেই সময়। যারা চলে এল তারা নিজে হাতে জমি চাষ করতে রাজি নয়। এরা সবাই বলতে গেলে গ্রামের ভদ্রলোক। গ্রামে ছিল নিজের জমি ভাগে দিয়ে বসে খাওয়ার অভ্যেস। শহরে এসে এরা পড়ল মহা ফাঁপরে। পুঁজি বলতে ব্যাঙের আধুলি। তাও সব সময় খুইয়ে ফেলায় ভয়। গতরে খাটার মুরোদ নেই, তার ওপর আছে চক্ষুলজ্জা। এদেরই মধ্যে হা-হুতাশ আর চোখ টাটানোর ভাব খুব বেশি। কবে কী ঘি খেয়েছিল সেই গন্ধ এখনও হাতে এদের লেগে আছে। আর যতটা নয় তার চেয়েও বেশি বঞ্চিত বলে এরা নিজেদের মনে করে।

বোলপুরের যারা বড়লোক তাদের বেশির ভাগেরই পয়সা হয়েছে ধানচালের কারবারে। বাইশটা ধানকলের মধ্যে এখন চলছে মোটে তেরো-চোদ্দটা। বেশির ভাগ কল অচল হয়ে আছে শরিকানার ঝগড়ায়। চালু কলের অর্ধেক কিনে বা ভাড়া নিয়ে মাড়োয়ারিরা চালাচ্ছে। এইসব কল থেকে বছরে আয় হয় শুধু প্রকাশ্যেই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। লুকো-ছাপার হিসেব যে কত তা কেউ জানে না।

এই টাকায় কেউ ভূ-সম্পত্তি করছে, কেউ বা আড়তদারি বা সুদখোরি কারবারে টাকা লাগাচ্ছে। খুব কম টাকাই যাচ্ছে

উৎপাদনের খাতে। এক সময়ে টাকাওয়ালারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বাস-লরির ব্যবসায়। তাতে অনেক নতুন নতুন বাসরুট খুলেছিল। গত তিন বছর ধরে তাতে ভাঁটার টান। কেননা তেলের খরচ তো বটেই, সেই সঙ্গে মোটরপার্টস আর টায়ারের দাম বেজায় বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে এও ঠিক যে, বাসের যাত্রীও বেড়েছে বহুগুণ। একতলা একটা বাস থেকে হয় পুরোপুরি দোতালা বাসের আয়। কেননা বাসের চালের ওপর তিল ধারণের জায়গা থাকে না।

এক সময়ে বোলপুর ছিল ধানচালের বড় গঞ্জ। এখান থেকে কাঁচা চামড়ার আর তামাক খাওয়ার হুঁকো নানা জায়গায় চালান যেত। এখানে তাঁতের কাপড়েরও ভালো একটা বাজার ছিল।

বোলপুরের আসল নাম হল বলিপুর। লোকে বলে, সেকালে কোনো এক রাজা নাকি এখান থেকে দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে ছাগল বলি দিতে দিতে গিয়েছিল। তাইতে গ্রামের নাম হয়ে যায় বলিপুর। কলিকাতা যেমন কলকাতা, বলিপুরও তেমনি মুখে মুখে বোলপুর হয়ে গেছে।

বোলপুরে লক্ষ্মীর বাস। কিন্তু হলে হবে কি, শহরটার কোন লক্ষ্মীশ্রী নেই। পৌরসভা আছে, কিন্তু তার আয় বেশি নয়। ফলে বেশির ভাগই কাঁচা রাস্তা। পাকা ড্রেন হচ্ছে, কিন্তু তা দিয়ে সব জায়গায় ঠিকমতন জল নিকাশ হয় না। উপযুক্ত কলকব্জার অভাবে জলকল থেকেও না থাকার দাখিল।

এমনিতেই তো এ রাজ্যে বারোমাসে তেরো পার্বণ। তাছাড়া ঘাড়ের ওপর শান্তিনিকেতন। জেলায় পীঠস্থানও খুব কম নয়। আর আছে বড় বড় মেলা! তার ফলে, বোলপুরে বারো মাস তিরিশ দিন দর্শনার্থীর ভিড় থাকে। তারা থাক না থাক, এখানকার রাস্তাঘাট জলবিদ্যুৎ খাবারদাবার জলহাওয়া জনস্বাস্থ্য বাসস্থান—সব কিছুর ওপরই এই ক্রমবর্ধমান ভিড়ের চাপ সমানে এসে পড়ছে। তাতে পৌরসভার খরচ আছে, কিন্তু আয় নেই।

বোলপুরের যে বাজার, সেটাও পৌরসভার নয়। ব্যক্তিগত মালিকের। বাজারের ব্যাপারে যত দায় সব পৌরসভার। আর লাভের গুড়টুকু শুধু পিঁপড়েতে খায়।

২

শহরে ঘুরতে ঘুরতে টুরিস্ট লজের কাছেই দেখি স্কুলবাগান পাড়ায় এক পোলট্রি ফার্ম।

পোলট্রি কথাটা বাংলায় বেশ চালু হয়ে গেছে। অনেকে বলেন, যে ভাষা যত ধার করতে পারে সেই ভাষার তত মুরোদ। কিন্তু তাই বলে আদেখ্‌লেপনাও কি ভালো? আসলে সব সময় যে ঠেকায় পড়ে আমরা ধার করি তা নয়। এক তো সাহেবী শব্দের ব্যাপারে আমাদের কুছ্‌কাঙালী ভাব তো আছেই, তার ওপর আছে গা-মাথা একেবারেই ঘামাতে না চাওয়া।

তাছাড়া একটু নল্‌চে আড়াল দিলেও তো হয়! যেমন, পোল্‌ট্রি'র ব্যুৎপত্তিগত মানে ছানাপোনা। আমরা যেমন বলি 'পোলা' বা 'পুলে'। একটু কষ্ট করলে বাংলা-ঘেঁষা একটা শব্দ কি দাঁড় করানো যেত না? কিংবা 'ডেয়ারি'র ধ্বনি সাদৃশ্যে 'দোয়ারি' গোছের কোনো শব্দ?

গেটের ভিতর ঢুকে বাঁদিকে আপিস আর মুরগিঘর, ডানদিকে বসতবাড়ি।

ফার্মের যিনি মালিক, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। নাম তাঁর অজিত বসুরায়। পৈতৃক বাড়ি ছিল বরিশালে। এ অঞ্চলে অনেক দিন আছেন। দেখেই বোঝা যায়, বেশ উদ্যোগী পুরুষ। দিনের বেলায় ফার্মের তদারকি করে তাঁর ছেলে দেবাশিস। সে নাইটে বি-কম পড়ে। এ কাজ সে খুব খুশি হয়েই করে। হাতেকলমে কাজ করে নিজে নিজেই সে অনেক কিছু শিখেছে।

অজিতবাবুর ফার্মে ডিম হয় দৈনিক এক হাজার। নানা বয়সের ব্রয়লার মুরগি আছে চার হাজার। দুর্গাপুর আসানসোল ধানবাদ

থেকে পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যায়। চাহিদা প্রচুর। এ রাজ্যে বেশির ভাগ ডিম আসে পাঞ্জাব আর হরিয়ানা থেকে। ওরা শস্তায় মুরগির খাবার পায়। তাই ওরা কম দামে ডিম দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে মুরগির খাইখরচ এত বেশি যে, ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয় না। গত বছর বাদামখোলের দাম ছিল এক কুইন্টাল আশি টাকা। এ বছর তার ডবল দাম। কুঁড়োর দাম পঁচাত্তর থেকে বেড়ে হয়েছে দুশো টাকা। আর ফিশ্‌মিল দেড়শোর জায়গায় হয়েছে দুশো টাকা।

এ সত্ত্বেও অজিতবাবু বললেন, পোলট্রি হল বেশ লাভের ব্যাবসা। মুরগি পিছু মাসে এক টাকার ওপর লাভ। তাছাড়া আছে মুরগির সার। জমিতে দিলে ভালো ফলন হয়। এই তো সেদিন নলহাটি থেকে এসে তুঁত চাষের জন্যে এক ট্রাক সার কিনে নিয়ে গেছে।

পোলট্রির কথা তাঁর মাথায় প্রথম ঢোকায় পীস কোরের কিছু মেয়ে। সে আজ বছর বারো আগের কথা। প্রথমবার পোলট্রি করে একবার একটা বড় রকমের চোট খান। এক বন্ধুর কথা শুনে মহুয়ার খোল খেতে দেওয়ার পর চার-পাঁচশো মুরগি এক রাত্রেই সাফ হয়ে যায়। পরে জানা গেল, মহুয়ার খোলে আছে এক তীব্র বিষ। ও দিয়ে আসলে পোকামাকড় মারে।

আগে থেকে পোলট্রির বিষয়ে ওঁর কোনো ট্রেনিং নেওয়া ছিল না। ফলে, গোড়ায় গোড়ায় এই রকম অনেক আক্কেল সেলামি দিতে হয়েছে। এখন অবশ্য ঘাঁটাঘাঁটি করে পুরো ব্যাপারটাই বাপছেলের হাতে এসে গেছে।

ইচ্ছে ছিল এ অঞ্চলের আরও একটু খবর নেওয়ার। সব তো আর ঘুরে ঘুরে একার চোখে দেখা যায় না।

কিন্তু বোলপুর ব্লকের আপিস কেন যে শ্রীনিকেতনে, দীর্ঘ রাস্তা সাইকেল-রিক্সায় যেতে যেতে আমার মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকছিল

না' একজন বললেন, আসলে কি জানেন—প্রথম যিনি বিডিও হয়ে আসেন, তিনি ওখানে সুবিধে মতন একটা বাসা পেয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই ব্যাপারটা চলে আসছে। লোকের কী সুবিধে সেটা হিসেবের মধ্যে আজও আসে নি। ফলে, আমারও গাঁটগচ্চা কম হল না।

যখন পৌঁছলাম তখনই প্রায় লাঞ্চের সময়। বিডিও মশাইকে প্রশ্ন করে অসময়ে উত্ত্যক্ত করতে আমারই খুব খারাপ লাগছিল। তাই জানার ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে সারতে হল।

ব্লক এলাকায় সবই প্রায় ছোট ছোট শিল্প। ধানকল, হাস্কিং মেশিন, আটাচাকি, আইসক্রিম আর বেকারি। তেলকল আর সাবান কল। করাত কল, কোকব্রিক, খোলভাঙা গুঁড়ো করার কল। হিউম পাইপ তৈরি আর লেদের কাজ। ছাপাখানা আর প্ল্যাস্টিক কারখানা। কিছু কামারশাল, কিছু হাতের কাজ আর পটারি।

আর আছে এগারোটা ইঁটখোলা। ছমাস কাজ হয়। মালিকরা স্থানীয়। হাজার দুই লোক কাজ করে। সবাই আসে বাংলার বাইরে থেকে। একটা বড় দল আসে। তাদের বাড়ি দুম্‌কায়। এরা পোক্ত লোক; কতটা মাটিতে কী হারে বালি মেশাতে হয় এরা জানে। বাইরে থেকে এরা সপরিবারে এসে শেডের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকে। ছটা মাস মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। ফুরনের কাজ। মজুরি পায় হাজার করা দশ থেকে বারো টাকা। মিশিয়ে সাইজ করা, সাজিয়ে ভাটায় দেওয়া। তার জন্যে হাজারে আঠারো টাকা। ফায়ারিং তাদেরই করতে হয়। স্থানীয় লোক নেওয়া হয় না দুটো কারণে এক তো কাজ জানার ব্যাপার আছে। তাছাড়া স্থানীয় লোক হলেই তাদের পালপার্বণ থাকবে, ঘরের টান থাকবে। ছমাস মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে বলেই বাইরে থেকে লোক আনা।

ব্লকের হাল ফেরানোর জন্যে সি-এ-ডি-এ এক প্রকল্প করেছে। তার চৌত্রিশ দফা কর্মসূচী। এতে টাকা খরচ হবে আট কোটি আটষট্টি

লক্ষ। ওঁরা মনে করেন, এই টাকা খাটানোর ফলে এ অঞ্চলের লোক বাড়তি আয় করবে বছরে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।

অনেক আটঘাট বেঁধে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্প। ময়ূরাক্ষীর জল তুলে চাষের ক্ষেতে পৌঁছে দেওয়া হবে। পত্তন করা হবে ছোট ছোট শিল্প। অনেকে হাতের কাজ করে বাড়ি বসে রোজগার করতে পারবে। পোষা হবে গরু ছাগল শুয়োর আর হাঁসমুরগি। মজা পুকুরগুলোর সংস্কার করে সমবায় গড়ে তাতে হবে মাছ চাষ। পুরনো রাস্তা মেরামত, নতুন রাস্তা তৈরি। স্বাস্থ্যরক্ষা আর সমাজশিক্ষা। হাট বাজারের উন্নতি। ধর্মগোলার পত্তন। সব মিলিয়ে এক বহুমুখী পরিকল্পনা এর ফলে, ব্লকের বাড়তি আটত্রিশ হাজার কৃষি পরিবার বছরে তিনশো দিন কাজ পাবে।

জায়গায় জায়গায় অগভীর নলকূপ, কুয়ো আর ক্যানেল আওতাভুক্ত জমিতে নালা খোঁড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। অনেক পুকুরে একই সঙ্গে মাছ চাষ আর জলসেচের কাজ হচ্ছে। একটি ঘরের একশো পনেরোটি বাড়ি হয়েছে ভূমিহীন কৃষি মজুরদের জন্যে। বেকার যুবকেরা যাতে কাজ পায় সেইদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। একশো ছেলের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলোতে। যুবকদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ছটি ক্ষুদ্রশিল্প সমবায় সমিতি। মৎস্যজীবী যুবকেরা পাঁচটি সমিতি গড়েছে মাছ চাষের জন্যে। উপজাতীয় যুবকেরা গড়েছে সাতটি ধর্মগোলা। বোলপুরে তৈরি হচ্ছে একটি হিমঘর। পোকামারা ওষুধ আর সার কেনার জন্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দিচ্ছে। চাষীর ছেলেদের চাষের কাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে প্রশিক্ষণ শিবির হচ্ছে। এই রকম আরও কত কী।

এসব ফিরিস্তি পড়তে বা শুনতে যত ক্লান্তিকরই লাগুক, গ্রামে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে সংখ্যাগুলো তখন আর সংখ্যা থাকে না—জীবনের রঙে-রসে মেতে ওঠে।

শ্রীনিকেতনের একদল কর্মীর সঙ্গে কাছের একটা গ্রামে গিয়ে সেই কথাই আমার মনে হয়েছিল।

যে রাস্তা দিয়ে জীপ যাচ্ছিল সেই রাস্তাটা দেখিয়ে ঐ গ্রামেরই একটি ছেলে লাফিয়ে উঠে বলেছিল—এই দেখুন, এটা আমরা করেছি। প্রকাণ্ড পুকুর দেখিয়ে বলেছিল—ওখানে সমবায় থেকে আমরা মাছ চাষ করছি। গ্রামের ভেতর নারকোল গাছ দেখিয়ে বলল—আমরা লাগিয়েছি। এসব অঞ্চলে আগে কখনও নারকোল গাছ হত না।

রাস্তা, পুকুর, নারকোল গাছ—হঠাৎ যেন হাতের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার চোখের সামনে সব নেচে উঠেছিল।

চত্বরে বসেছিল বৈঠক। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। কেউ কেউ নেশা করে ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু বাকি সকলেই উৎসাহে যেন টগবগ করে ফুটছিল। এই হোক তাই হোক, এটা করব সেটা করব, আমি এটা দেব ও সেটা দেবে—শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারলে এদেশকে কত সহজে ঢেলে সাজানো যায়।

ফিরে আসার পথে গিয়েছিলাম শহরের এক ইস্কুলে। কথা বলে খানিকটা আঁচ করতে পারলাম শহরের ভদ্রলোকেরা কী চোখে শান্তিনিকেতনকে দেখেন।

এক তো লেখাপড়ার ব্যাপার। ডে স্কলার নেওয়ার বিধান থাকলে বোলপুরের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে থেকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পারে।

দ্বিতীয় ব্যাপার শান্তিনিকেতনে চাকরি।

এককথায়, প্রতিবেশী বলে বিশেষ সুবিধে পাওয়ার প্রত্যাশা।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এর পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শের প্রতি অনুরাগ, তাহলে দেখা দরকার, বোলপুরের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর শান্তিনিকেতনের কতটা ছাপ পড়েছে।

আমার ধারণা, খুব বেশি পড়ে নি। তার কিছু কিছু কারণ সহজেই আঁচ করা যায়। যে ব্যবস্থায় পরীক্ষায় পাশ করাটাই জীবনে কৃতকার্য হওয়ার একমাত্র উপায়, সেখানে তাকে বাদ দিয়ে কজন ছাঁ পোষা গৃহস্থ ছেলেমেয়েদের আম্রকুঞ্জে পড়ানোর ঝুঁকি নেওয়ার কথা ভাবতে পারে ?

মেয়েদের নিয়ে আরও মুশকিল। তাদের পক্ষে শান্তিনিকেতনের খোলামেলা বাঁধন-ছেঁড়া নাচানে আবহাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। ভালো ঘর-বর দেখতে হবে। কুষ্ঠি মেলাতে হবে। শান্তিনিকেতনের ছাপ থাকাটা কি বোলপুরের মেয়ের বাবার পক্ষে অস্বস্তিকর হবে না ?

আসলে বোলপুর কখনই শান্তিনিকেতনে নিজেকে মিশিয়ে দেবে না। কেনই বা দেবে ? বোলপুর আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে পার্থক্যের ধরনটাও তাই বলে পিছিয়ে থাকা আর এগিয়ে যাওয়ার হবে না।

বোলপুর নিজের মতো করে এগোবে। শান্তিনিকেতনের পেটের খোরাক যদি বোলপুর যোগায়, শান্তিনিকেতন বোলপুরকে যোগাক মনের খোরাক। তাহলেই তো আর কোনো ঠোকাঠুকি নেই।

স্টেশনে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল। একদিন স্টেশন থেকে শান্তি-নিকেতন যেতে বোলপুরের রাস্তাটুকু চোখ-কান বুঁজে পার হয়ে যেতাম। শান্তিনিকেতন থাকত লক্ষ্য, আর বোলপুরটা উপলক্ষ্য মাত্র।

বলতে গেলে, এই প্রথম চোখ মেলে বোলপুরকে দেখলাম। তাও খুব ওপর-ওপর।

বোলপুরকে চিনতে গেলে আরও বার কয়েক আমাকে আসতে হবে।

শান্তিনিকেতনকে তার পুরনো নামে এখনও যদি ডাকা যায়, তাহলে বলব ভুবন নগর এড়িয়ে ভুবনডাঙা। এবারে সফরটা আমার ভালোই হল

তামাম শোধ

গোড়ায় যেটা গেয়ে রেখেছিলাম. এখন দেখছি সেটাই শেষকালে সত্যি হতে চলেছে।

বছর চল্লিশ হতে চলল বাংলার গ্রামেশহরে আমার ঘোরাঘুরির বয়েস। ঘোরাঘুরির বৃত্তান্ত নিয়ে লিখেছিও কম নয়। কাগজে বেরোলে তবু লোকে পড়েছে, কিন্তু বইয়ের লেখা পড়েছে খুবই কম লোক।

যে কাগজ লোকে পড়ে, যাতে বেরোলে লেখকের তবু মজুরিতে পোষায়—তাতে প্রায়ই লেখার ঠাঁই থাকে না। আর ইলেকশন এসে গেলে তো কথাই নেই। তাই শুরু ক'রেও শেষ পর্যন্ত আনন্দবাজারে 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' লেখা বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের আগ্রহ কম ছিল বলব না। কিন্তু একে স্থানাভাব, তার ওপর পাঠকের চাহিদা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তাঁদের মেটাতে হয়। কেননা পাঠকই লক্ষ্মী।

'এক যাত্রায়' বেরিয়েছিল 'আনন্দ মেলায়'। ফলে, লিখতে হয়েছিল একটু নল্‌চে আড়াল ক'রে।

সে যাই হোক, যা চেয়েছিলাম তা হয় নি।

পাঠকের যে তাতে বয়েই গিয়েছে, এটা লেখকের অভিমানের কথা নয়। অভিজ্ঞতা তাই বলে।

এ প্রসঙ্গে 'আমার বাংলা' আমার প্রথম বই হলেও, প্রথম লেখা নয়।

'জনযুদ্ধে'ই এ ধরনের লেখায় আমার প্রথম হাতেখড়ি। তবে বর্ধমানে বিয়াল্লিশের বন্যায় আমি ঠিক রিপোর্টার হিসেবে যাই নি। গিয়েছিলাম দুর্গতত্রাণের জন্যে কলকাতার নৌকোর মাঝিমাল্লাদের পৌঁছে দিয়ে আসার কাজে। রিপোর্টার ক'রে আমাকে পাঠানো হত কালেভদ্রে।

এই ব্যাপারে একজনের কাছে আমি খুব ঋণী। তিনি হলেন সে সময়কার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি-সি-যোশী। পূরণ চাঁদ যোশী।

আমাকে যাতে মফস্বলে রিপোর্টার ক'রে পাঠানো হয়, তার জন্যে অনুরোধ ক'রে বাংলার পার্টি-নেতাদের কাছে তিনি বিস্তর চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। কারণ, ডেস্কের কাজে আমাকে তখন দরকার।

একবার বাংলার প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, যোশী ম্যাণ্ডেট পাঠিয়েছে। সুতরাং আর উপায় নেই।

দেখা গেল, আপাতপ্রয়োজন ম্যাণ্ডেটের কথাও ভুলিয়ে দিতে পারে।

তাই ব'লে আমার তাতে খুব একটা ক্ষোভ ছিল না। সে সময় সোমনাথ লাহিড়ী আমাকে সাংবাদিক হিসেবে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করছিলেন। কাগজের আপিস সব সময় সরগরম।

একটা কাগজ চালাতে গেলে যা যা দরকার তার সবটাই আমার হাতেকলমে শেখা হয়ে যাচ্ছে। সহ-সম্পাদনার যাবতীয় কাজ : টুকরো জোড়া দেওয়া, বাহুল্য ছাঁটাই, আসল কথা খুঁজে বার করা, যেটা জোরখবর সেটা খুঁজেপেতে গোড়ায় আনা, হেডিং-সাবহেডিং করা, হরফের মাপ আর চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া ; লে-আউট, ব্লক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আর আগ্রহ। এর ওপর আছে প্রুফ পড়া,

ছাপাখানায় উপস্থিত থেকে তদারকি করা ; দরকার হলে কম্পো-জিটারের সাকরেতি করা, বাবা-বাছা ব'লে কাজ করিয়ে নেওয়া। কী নয়।

সেইসঙ্গে বাণ্ডিল বেঁধে ডেসপ্যাচের সময় ডাকটিকিট সাঁটা, ঠিকানা লেখা। সব কিছু। বাইরের লোকে মনে করত গাধার খাটুনি। কিন্তু সব কাজেই তখন আমাদের আনন্দ ছিল। ছোট বড় ভেদ ছিল না। ম্যানেজার প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজে হাতে বাণ্ডিল বাঁধতেন। বলতেন, একটা গান বাঁধুন—যাতে আরও তাড়াতাড়ি হাত চলে।

'জনযুদ্ধে'র সময় বাংলার ভূগোল ছিল আমার কণ্ঠস্থ। গ্রামের নাম বললে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব'লে দিতে পারতাম কোন্ পোস্টাপিস্, কোন্ থানা, কোন্ মহকুমা, কোন্ জেলা। চিঠি প'ড়ে আর কাগজ পাঠিয়ে সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। খুব প্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হবে না। সাংবাদিক জীবনের কথায় তবু না ব'লে পারছি না।

তখন লোয়ার সার্কুলার রোডে আমাদের আপিস। দৈনিক স্বাধীনতা সবে বেরিয়েছে। কাজের চাপে বাড়ি ছেড়ে আমাকে তখন থাকতে হচ্ছে সেন্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারের কমিউনে। লাহিড়ী, সরোজ মুখোপাধ্যায়—আমরা সবাই এক বাড়িতে।

নৃপেন চক্রবর্তী ছাড়া আগে আমরা কেউ কখনও দৈনিকে কাজ করি নি। সাপ্তাহিকের বিদ্যায় দৈনিক। কাজটা সোজা ছিল না। কিন্তু আমাদের নেতাদের ছিল সাহস। পাশের বাড়ি ডিক্সন লেনে প্রেস। দেয়াল ফুটো ক'রে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা হল।

তখন আমাদের নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। একে লোকবল কম, তায় অনভিজ্ঞ ব'লে সময়ও বেশি লাগে।

একদিন সাত সকালে এসেছি। কাজ করতে করতে কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে খেয়াল নেই।

হঠাৎ একজন এসে বলল, যোশী ডাকছেন।

পাশেই একটা ছোট্ট ঘরে পি-সি যোশী সে সময়ে কলকাতায় এলে থাকতেন।

গিয়ে দেখি দুটো প্লেটে ঢেলে টিফিনকেরিয়ার থেকে একজনের খাবারকে দুজনের করা হয়েছে। যোশী শুধু বললেন, খাও।

পরিপাটি করে খেয়ে গিয়ে আবার কাজে বসলাম। যোশী নিজের কাজ করতে করতে খাচ্ছিলেন। সুতরাং দুজনের মধ্যে আর কোনো বাক্যালাপই হল না।

তাছাড়া যোশী যখন কথা বলতেন, তাঁর বেশির ভাগ কথাই বুঝতাম না। একে তোতলা, তার ওপর কমা-ফুলস্টপের বালাই থাকত না।

যোশীর সেই এক চিল্‌তে ঘরে যেতে হলে যে হলঘরটা পেরোতে হত, আমি তার এককোণে বসতাম। নিজের ঘরে যাবার সময় নিশ্চয় আমাকে তিনি দেখেছিলেন এবং এক নজরেই বুঝেছিলেন আমার খাওয়া হয় নি।

ঘটনা হিসাবে এটা বড় কিছু নয়। এমন নয় যে একবেলা না খেলে আমি মরে যেতাম। কিন্তু একজন বড় নেতা হয়েও একজন সাধারণ কর্মী সম্বন্ধে এই দরদী মনোভাব চিরদিনের মত আমার মনে ছাপ রেখে গেল।

সাধারণ সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের কাগজের ঐখানেই ছিল তফাত। সবার সঙ্গে ছিল হৃদয়ের যোগ। সম্পাদক, ম্যানেজার আর আমাদের ছিল সমান মাইনে। পনেরো থেকে বেড়ে কুড়ি, তারপর পঁচিশ।

বাইরে যখন যেতাম, রাস্তায় খরচ করতাম নামমাত্র। কাগজ তো আমাদের। গোয়ালন্দ থেকে এতবার স্টীমারে গিয়েছি,

কোনদিন ভাত খাই নি। কেবল লেড়ো বিস্কুট আর চা। পদ্মার স্টীমারে মুরগির ঝোলের কী স্বাদ কখনও জানা হয় নি।

হঠাৎ একবার মাইনে নিতে গিয়ে আমি অবাক। গুণে দেখি এক শো টাকা। প্রমোদবাবুর দিকে তাকাতেই চাঁছাছোলাভাবে বললেন, ওটাই এখন আপনি পাবেন।

কারণটা তখনই আঁচ করতে পেরেছিলাম। তার মাসখানেক আগে দাদা মারা গেছেন। তার আগেই বাবা সামান্য পেন্সনে রিটায়ার করেছেন। অথচ মাইনে বাড়ানো নিয়ে কোনো কথাই হয় নি।

তার মানে, আমারই তখন সর্বোচ্চ বেতন। মন ঠিক সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু চোখে জল এসে গিয়েছিল। অবশ্য দুচার মাসের মধ্যেই পার্টি আর কাগজ দুইই বেআইনী হওয়ায় এবং আমাকেও জেলে যেতে হওয়ায় বেশিদিন তা ভোগ করতে হয় নি।

কিংবা আরেকটা কথা। নৃপেন চক্রবর্তী একদিন আমার কাটাকুটি-করা নোংরা লেখা দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—পরিষ্কার গোটা গোটা ক'রে লেখো না কেন! এঁদো ঘরে ব'সে যে কম্পোজ করছে, তার কথাটা একবার মনে করো না কেন? দেখ, আমি এক সময়ে কম্পোজিটারি করেছি, এতে যে কী কষ্ট হয় আমি তা বুঝি।

তারপর থেকে আজ অবধি প্রেসের জন্যে লিখতে গেলেই অক্ষর-গুলো যথাসম্ভব স্পষ্ট করার দিকে আমার ঝোঁক থাকে। কেন না নৃপেনদার তর্জনীটা আমার চোখের ওপর ভাসে।

এ সব শুনে হয়ত একটু অবান্তর মনে হবে। কিন্তু সাংবাদিকের জীবন শেষ করতে গিয়ে কথাগুলো আপনিই মনে আসছে। কেননা সাংবাদিকের সঙ্গে যোগ শুধু লেখার নয়। ছাপাখানার সঙ্গেও তার থাকা দরকার ঘনিষ্ঠ যোগ।

অনেকদিন আগে বুদাপেশ্‌তের সাংবাদিক সঙ্ঘে একবার আমাকে বলতে হয়েছিল। কালান্তরের চীফ রিপোর্টার দিলীপ চক্রবর্তী আর পাটনার জনশক্তির সম্পাদক গঙ্গাধর দাস তখন হাঙ্গেরিতে। বিষয়

ঠিক হয় : আমার সাংবাদিক আর সাহিত্যিক জীবন, এ দুইয়ের যোগসূত্র। বলেছিলাম আমার দুর্বল ইংরিজিতে। আমার বলবার কথাগুলো কারো কারো ভালো লেগেছিল। আমি বলেছিলাম কাগজ কি ভাবে আমাকে গ্রামশহরের সাধারণ মানুষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে শুধু যে নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম তাই নয়—বাংলাভাষার প্রাণপুরুষেরও সন্ধান পেয়েছিলাম।

পার্টির কাগজে কাজ করার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে। সবচেয়ে বড় সুবিধে, সাধারণ লোকের কাছে নিজেকে বাইরের মানুষ ব'লে মনে হয় না। তারাও বিশ্বাস করে নিজেদের মনের কথা খুলে বলে। কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়লে যে গোলযোগ বাধে, সেখানে কাগজ লেখকের পক্ষ নেয়। তেমনি আবার কাগজের সঙ্গতি থাকে না ব'লে সাংবাদিকের গতিবিধি হয় খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া পাঠকের পরিধি সঙ্কীর্ণ হলে সুখী পরিবার গড়ে উঠে ধরতাই বুলি আওড়ানোর ঝোঁক বাড়ে। নিজেদের গণ্ডীর বাইরে ছড়ানো আর দূরের মানুষকে কাছে টানা শক্ত হয়। কর্মক্ষেত্রে ফলিতভাবে নিজেদের মত আর নীতি যাচাই করার বদলে গোঁড়ামি আর মতান্ধতায় কেবলি আত্মসমর্থন খুঁজতে গিয়ে লেখক বিপথে চালিত হন। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে এ জিনিস বহুবার ঘটেছে। বিশেষ ক'রে, চল্লিশের দশকের শেষাশেষি।

মালিক-পরিচালিত কাগজ সম্পর্কেও ঢালাওভাবে আমরা যা বলি তা কি ঠিক? এসব কাগজের অস্তিত্ব একান্তভাবেই মালিকনির্ভর ব'লে যাঁরা মনে করেন, পাঠকনির্ভরতার দিকটা তাঁরা একেবারেই উড়িয়ে দেন। পাঠকেরা পড়েন বলেই এসব কাগজের এত চল। কাগজের সব কথাই পাঠকেরা বেদবাক্য ব'লে মানলে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের এত ভোট পেতে হত না। মালিকদেরও অগত্যা পাঠক-দের হাতে রাখতে হয়। পাঠকদের পয়সায় চলে ব'লে (বিজ্ঞাপন-দাতাদের কথা আমি ভুলে যাই নি; কিন্তু পাঠক ধরতে না পারলে তাঁরা কি কাগজগুলোকে এমনি এমনি পয়সা দিতেন?), এক

হিসেবে পাঠকেরাও কাগজের অংশীদার। কাগজের ওপর কেন তাঁরা তাঁদের দাবি খাটান না? যাঁরা কাগজ পুড়িয়ে কাগজের কণ্ঠরোধ করলেন ভেবে নিজেদের মনকে চোখ ঠারেন, পাঠকের ন্যায্য দাবির দিকটা কেন তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়?

এইসব কাগজে যারা লেখে (চাকরি করলে তো কথাই নেই), ধরেই নেওয়া হয় তারা দালাল। তারা আসলে লেখে না, মালিকরাই তাদের হাত দিয়ে সব সময় লিখিয়ে নেয়। যাঁরা মনেপ্রাণে এতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা ভুলে যান লেখকদের চেয়েও তাঁরা সবচেয়ে বেশি অসম্মান করছেন সাধারণ পাঠকদের।

আবার কিছু আছেন, যাঁরা এসব কথা বলে বেড়ান গাত্রদাহের জন্যে। মতে না মিললেই একজনকে দালাল বলতে হবে?

পার্টি ভাগ হওয়ার পর রাস্তায় আমার এক পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেছিলেন, 'জানেন তো, আপনার সম্পর্কে এখন আমরা কী বলেছি?'

আমি আন্দাজ করলাম নিশ্চয় 'শোধনবাদীটাদী' গোছের কিছু একটা খারাপ কথা হবে। বলতে বন্ধুটি বললেন, 'না, না, আমরা বলছি আপনি আনন্দবাজারে বেনামীতে সম্পাদকীয় লিখে হাজার হাজার টাকা পাচ্ছেন।'

আমি থ' হয়ে গেলাম। জিগ্যেস করলাম, 'তার মানে, আপনারা জানেন যে সেটা সত্যি নয়?'

উত্তরে বন্ধুটি বললেন, 'হ্যাঁ, মানে, এই সবই এখন আমাদের বলতে হবে।'

আঠারো উনিশ বছর আগের কথা। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথা এখনও থেকে থেকেই শুনতে পাই।

কারো মুখে হাতচাপা দেবার জন্যে আমি এসব বলতে চাইছি না। আমি শুধু আহাম্মকদের এইটুকু আক্কেল দিতে চাই যে, হাজার শত্রুকেও কখনও মিথ্যে দিয়ে মারা যায় না।

চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় বিদায়-সম্বর্ধনায় কোনো নিহ মুখচোরা লোককেও অনেক সময় স্পর্ধিত এবং প্রগল্‌ভ হতে দে যায়। সহকর্মীরা তাতে মজা পান। মুখ টিপে হাসেন। এসব ক্ষো স্মৃতিরোমন্থনও যে খুব যুক্তিপরম্পরায় বাঁধা থাকে তাও নয়।

কাজেই আমার এ লেখাটা হয়ত দোষের হবে না।

শুধু যাঁরা এতদিন আমার এই ধরনের ঘোরাঘুরির লেখ আশকারা দিয়েছেন, তাঁদের আমি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে চাই। তা না হলে আমার দিক থেকে [illegible] নেমকহারামি হবে।

লিখে তো দিলাম, তামাম শোধ। কিন্তু জীবনের [illegible] করা কি অতই সোজা ?